আলপনা

জয়মাল্য

(১)

কিছু না কিছু রূপ সকলেরই থাকে কিন্তু তার মতো এমন কালো কুরূপ বুঝিবা জগতে কেউ ছিল না। মুখের মধ্যে পুরু পুরু কালো কালো ঠোঁট দুখানা এবং কুলোর মত কান দুটো তার চেহারাকে অতি ভয়ানক করে তুলেছিল।

কিন্তু বাহিরটা তার যেমনই হ'ক অন্তরটা ভারি চমৎকার ছিল—এমন মাধুর্য্য, এমন

কোমলতা, এমন শান্তভাব অতি অল্প লোকের হৃদয়েই দেখা যায়। মুখখানা যদিও কঠোর কদাকার কিন্তু তাতেই সময় সময় এমন মিঠে হাসি ফুটে উঠত যে তার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা যায় না। তার সেই গোল গোল ভাটার মতো চোখ দুটো এমন একটা স্বর্গীয় আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠত, মনে হ'ত যেন তার ভিতরকার সৌন্দর্য্য বাহিরের কালো আবরণ ছিন্ন করে প্রকাশ পাবার জন্য আকুলি ব্যাকুলি করচে!

তার অন্তরে এত সৌন্দর্য্য তবু কাউকে সে আকর্ষণ করতে পারলে না। কেউ তাকে চিনলে না। কেউ তার অন্তর দেখে না, সবাই বাহিরটাই দেখে! সবাই মুখ ফিরিয়ে চলে যায়! এই দুঃখে তার অন্তর থেকে থেকে জ্বলে যেত!

সে যেখানে বসে সেখানে কেউ আসে না। সে যা বলে তাতে কেউ কান পাতে না।

মাকাল ফলের মতো কেবল বাহিরটা

যাদের সুন্দর তারাও সর্ব্বত্র আদর পায় কিন্তু তার স্থান কোথাও নেই।

কবি সে!

নিজের দুঃখ কাহিনী নিয়ে সে গান বাঁধত, আপন মনে সেই গান গাইত, কেউ তা কান পেতে শুনতনা।

প্রেমিক সে!

প্রেমে হৃদয় তার পূর্ণ—কিন্তু সে কথা কেউ বিশ্বাসই করতনা।

সে দেশের রাজকন্যাকে সে একবার মাত্র দেখেছিল। সেই দেখাতেই ভালোবাসা। সে ভালোবাসা তার অন্তরে কোথায় গোপন ছিল, ইসারাতেও কেউ কোনো দিন জানতে পারেনি।

(২)

রাজা একবার দেশের কবিদের ডেকে জড়ো করলেন ;—কে সব চেয়ে বড় কবি তারই বিচার হবে।

বড় বড় নামজাদা কবিরা এসে আসর জুড়ে বসলেন—তার মধ্যে সেও গিয়ে বসল। তাকে দেখে সবাই বিরক্ত—আরে নোলো, এটাও এখানে! স্পর্দ্ধা তো কম নয়!

সে সব বুঝলে। কথাটি না কয়ে হেঁট মাথা করে বসে রইল।

কারুর বাড়ি সে কখনো নিমন্ত্রণ পায়নি, নিমন্ত্রণ যায়ওনি। আজ যে সে রাজসভায় এসেছে সে কেবল দুঃখের বোঝাটা একটু হাল্কা করে নেবার জন্যে। বুক তার ফেটে যাচ্ছে—সে আর পারেনা—অপমান অবজ্ঞা সইতে আর পারেনা! সে যে মানুষ, তার যে হৃদয় আছে, সে যে ব্যথা পায় একথা দেশের লোক কেউ

তো স্বীকার করে না—তাই আজ সে সভার মধ্যে দাঁড়িয়ে সকলকার সমুখে জোর করে সেই কথা বলে যাবে—তাই আজ সে এখানে এসেছে।

(৩)

কবিদের একে একে ডাক পড়ল। কেউ সন্ধ্যা বর্ণনা করলেন, কেউ প্রভাত বর্ণনা করলেন, কেউ রাজস্তুতি করলেন। সকলের যখন শেষ হ'ল সে তখন উঠে দাঁড়াল। আশ-পাশের লোকেরা তাই দেখে টিট্‌কারি দিয়ে উঠল—সে কিন্তু দৃকপাতও করলে না।

সভার সকলকে আহ্বান করে ছন্দে গাঁথা নিজের কাহিনী সে বলতে আরম্ভ করলে। মুহূর্তের মধ্যে সভা স্তব্ধ! কোথায় রইল টিট্‌কারি, আর কোথায় রইল শ্লেষ উক্তি!

বীণার তারে তারে যেমন ঝঙ্কার বেজে ওঠে, কবিতার ছন্দে ছন্দে তেমনি ঝঙ্কার

উঠতে লাগল। সমস্ত সভার মধ্যে একটা করুণ রসের স্রোত বহে গেল—সকলকার মর্ম্ম বেদনায় স্পন্দিত হয়ে উঠল, হৃদয় দ্রব হয়ে গেল।

সবাই অবাক্! যারা তার মুখের পানে মুখ তুলে কখনো চায়নি, আজ তারা বিস্ময়ে তার পানে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। চোখ আর নামাতে পারেনা। কোথায় রইল ঘৃণা, কোথায় রইল অবজ্ঞা, কোথায় গেল তার কালো মূর্ত্তি! সবাই দেখলে যেন এক দিব্য পুরুষ স্বর্গ থেকে নেমে এলেন।

সভার মধ্যে যে এই কাণ্ডটা ঘটে গেল—সবার কাছ থেকে সে যে সম্মান লাভ করলে, সেটা সবাই বুঝতে পারলে, সবাই দেখলে, দেখলেনা কেবল সে নিজে। চোখ্ বুজে—মনের কাছ থেকে জগৎ সংসার সরিয়ে দিয়ে—ভোলামনে আপনার দুঃখের গানই সে গেয়ে যাচ্ছিল। গান যখন শেষ হ'ল,

রাজকন্যা এসে তারই গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দিলেন। চারিদিকে শঙ্খধ্বনি উঠল। সে তখন চোখ খুলে দেখে সামনে রাজকুমারী! তাঁর বাহুদুটি তার বুকে এসে ঠেকেছে, তাঁর নিশ্বাস তার গায়ে এসে লাগচে!

বর লাভ

সে অপর জগতের কথা। সেখানকার সঙ্গে এখানকার কিছুই মেলে না। সে জগৎ এখান থেকে অনেক দূর ;—অনন্ত আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রমণ্ডলীর মাঝখানে কোনো এক জায়গায় তাহার স্থান।

সেখানে এক পুরুষ ও এক রমণী থাকিত। একটি বোঁটায় যেমন দুটি ফুল তেমনি ভাবে তাহারা মিলিয়া ছিল। দুজনের মধ্যে কোথাও বিচ্ছেদ ছিল না।

সেখানে এক প্রকাণ্ড বন ; তাহাতে ঘন ঘন গাছের সারি!—এক গাছ অপর গাছের সহিত গায়ে গায়ে ঠেকিয়া আছে, মধ্যে এতটুকু ব্যবধান নাই। বনের যা-কিছু-সকলই এক অপরের সহিত নিবিড়ভাবে মিলিয়া আছে। কোথাও বিচ্ছেদ নাই ;—পাতায়

পাতায়, ডালে ডালে, ফলে ফলে, ফুলে ফুলে ঠাসা। আকাশের বাতাস, আকাশের জল এবং সেখানকার যে চন্দ্রসূর্য্য তার রশ্মি পর্য্যন্ত সেই গহন বনের বনস্পতি আর তরুলতাদের সুদৃঢ় মিলন ভাঙিয়া প্রবেশের পথ পায় না।

সেই বনের মাঝে এক মন্দির। সে যে কতকালের তার ঠিক নাই! সে মন্দিরে কেহ থাকিত না, রাত্রে সেখানে দেবতারা আসিতেন। শুনা যায়, সেই সময়ে—সেই ঘোর রাত্রে অন্ধকার বনের মধ্যে জনপ্রাণী সঙ্গে না লইয়া একেলা কেহ যদি মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হয়, এবং মর্ম্মর সোপানে নতজানু হইয়া দেবতার আরাধনা করে ও দেবতার উদ্দেশে বুক চিরিয়া রক্ত দেয় তাহা হইলে দেবতার কাছে সে যে প্রার্থনাই জানায় তাহা গ্রাহ্য হয়!

পুরুষ ও রমণী বহুবার এই মন্দিরে গিয়াছে, বহুবার দেবতার কাছে দুজনে

দুজনায় মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছে কিন্তু দুই জনের মধ্যে কেহ কখন একা সেখানে যায় না।

এক পূর্ণিমার রাত্রে পুরুষটিকে সঙ্গে না লইয়া রমণী একেলা মন্দির উদ্দেশে ঘরের বাহির হইয়া গেল! বনের বাহির তখন জ্যোৎস্নার প্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছে, জলস্থল আকাশ, শুভ্রতায় ভরিয়া গিয়াছে;—আকাশে নীলিমা নাই, সমুদ্রেও নীলিমা নাই! সব আলোময়, কেবল বনের ভিতর ঘোর অন্ধকার—সেখানে জ্যোৎস্না নাই! আলো নাই।

রমণী সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে পথ চলিয়া মন্দির-সোপানে আসিয়া বসিল। ভক্তিভরে দেবতার নাম জপ করিতে লাগিল, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তখন সে একখণ্ড পাথর লইয়া মর্ম্মস্থলে আঘাত করিল;—ধীরে ধীরে বিন্দু

বিন্দু রক্ত বুক বাহিয়া মন্দির-সোপানে পড়িল। অমনি শব্দ উঠিল—"কি চাও?"

রমণী বলিল—"এক পুরুষ আছেন, তিনি আমার কাছে জগতের মধ্যে সব চেয়ে প্রিয়, তাঁকে আপনি বর দিন।"

—"কি বর চাও?"

—"তা তো জানিনা প্রভু! যাতে তাঁর সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয় সেই বর দিন।"

—"তথাস্তু!"

বহুদিনের আকাঙ্ক্ষার সফলতা লাভ করিয়া আজ সে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এত আনন্দ সে জীবনে কখনও উপভোগ করে নাই—সে আনন্দের ভাগ পুরুষটিকে দিবার জন্য সে অধীর হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে না চলিয়া মনের উৎকণ্ঠায় দৌড়িতে লাগিল। স্থির বন দ্রুতপাদক্ষেপে কাঁপিয়া উঠিল, স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শুষ্কপত্র হইতে কান্নার মত মর্ম্মর

ধ্বনি উঠিল। অন্ধকারের মধ্যে সেই শব্দ শুনিয়া রমণীর প্রাণ চকিত ও ভীত হইয়া উঠিতে লাগিল।

শীঘ্রই সে বনের বাহির হইয়া আসিল, সে স্থান অন্ধকার নয়, সেখানে তখন বসন্তের বাতাস বহিতেছে, পুষ্পগন্ধে দিক ভরিয়া আছে; দূরে সমুদ্রতীরের বালুকা জ্যোৎস্না-আলোকে আকাশের নক্ষত্রের মতো জ্বলিতেছে! সমুদ্রতরঙ্গ চন্দ্রালোকে নাচিতেছে! আকাশে, বাতাসে, জলে স্থলে আনন্দ রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে।

রমণী সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। অদূরে একখানি তরণী সমুদ্রের বুকে দিব্য ভাসিয়া যাইতেছে, কোথাও আটক নাই, বাধা নাই; সমুদ্র-তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে।

রমণী ভাবিল—"এমন্ রাতে এমন্ সময়



দেশ ছাড়িয়া কে যায়? কে ঐ তরণীর দাঁড় ধরিয়া দাঁড়াইয়া?"

অস্পষ্ট আলোকে তাহাকে চেনা যাইতেছিল না, তাহার মুখ ভালো করিয়া দেখাও যাইতেছিল না, কিন্তু রমণী অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিতে পারিল কে সে! সে মূর্ত্তি যে তাহার হৃদয়পটে আঁকা—সে যে চিরপরিচিত!

তরী ক্রমেই দূর হইতে দূরে যাইতে লাগিল, ক্রমেই সব অস্পষ্ট হইয়া আসিল। এমন সময় সে কি দেখিল?—এ কি? এক পরমাসুন্দরী বালিকা—তরণীর হাল ধরিয়া বসিয়া আছে;—তাহার সুন্দর নবীন মুখে জ্যোৎস্নার শুভ্র আলো!

রমণীর প্রাণ উতলা হইয়া উঠিল। সে পাগলিনীর মতো ছুটিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে গেল—নৌকা আটক করিবে। কিন্তু সমুখে সমুদ্রতরঙ্গ দুর্গপ্রাচীরের মতো ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে! তাহা ভেদ করিয়া যাওয়া

অসাধ্য। তবে সে কি করিবে? নিরুপায় হইয়া কাঁদিতে লাগিল। সমুদ্রের দিকে আকুলভাবে বাহুদুটি প্রসারিত করিয়া শুধু বলিতে লাগিল—এস হে ফিরে এস, বঁধু হে, ফিরে এস!

রমণী জলে নামিয়া পড়িয়াছে, তরঙ্গ-প্রাচীর ভেদ করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইবার জন্য যুঝিতেছে এমন সময় তাহার কানের পাশে কে যেন বলিল—"এ কি করচিস্?"

বালিকা উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—"আমি যে এইমাত্র তার জন্যে বুকের রক্ত দিয়ে দেবতার কাছ থেকে বর ভিক্ষা করে এনেচি!"

কানের পাশে আবার কে বলিল —"বেশ তো! বর তো সে পেয়েছে!"

—"কী বর পেয়েছেন?"

—"তোর সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল;—তোর সহিত তার অনন্ত বিচ্ছেদ!"

রমণী স্তম্ভিত হইয়া গেল!

তরণী তখন অগাধ সমুদ্রের মধ্যে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেছে!

আবার শব্দ উঠিল—"কেমন্, তুই তো সুখী?"

রমণী ধীরে ধীরে কহিল—"হাঁ, সুখী!"

চারিদিক তখন স্তব্ধ হইয়া গেল, আকাশে বাতাসে করুণ রাগিণী বাজিয়া উঠিল। রমণীর চরণ ঘেরিয়া সমুদ্রের চঞ্চল জল ছল্ ছল্ করিয়া কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল!

ভিক্ষুকের হৃদয়

তার নিজেরই মতো হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া একটা লোকের সঙ্গে যখন চৌরাস্তার মোড়ে রাতদুপুরে দেখা তখন সে লোকটা তাহাকে বলিল—"দ্যাখো, আজ যদি একটা দাঁও মারতে চাও তাহলে এই রাস্তা ধরে বরাবর দক্ষিণ মুখে চলে যাও—সামনেই একটি বেশ ছোট্টখাট্ট বাড়ি দেখতে পাবে—তার পাঁচিল তেমন উঁচু নয়—ফটকও তথৈবচ। বাড়িতে জনমানুষ নেই—একটা বুড়ো মালী পাহারা দেয়; সে আজ জ্বরে পড়েছে। যে কুকুরটা বাড়ীময় ঘুরে ঘুরে বেড়াত সেটাও আজ কদিন হল মারা গেছে। এমন সুবিধে আর কখনো পাবে না—বুঝলে!"

এই কথার উত্তরে কিছু না বলিয়া সে বরাবর দক্ষিণমুখে চলিয়া গেল। খানিক

পরেই একটা পুল। পুল পার হইয়া শাল বন। ঘোর আঁধার। পথে লোক নাই; সে ধীরে ধীরে চলিয়াছে। গায়ে তার একটা ছেঁড়া কম্বল জড়ানো। তাহাতে, সেই অন্ধকারে তাহার চেহারা ভালো দেখা যাইতেছিল না, মনে হইতেছিল একটা ছায়া যেন হাঁটিয়া চলিয়াছে। ঘাসের উপর পা পড়াতে চলার কোনো শব্দ উঠিতেছিল না। চারিদিক স্তব্ধ হইয়া ছিল।

কম বয়সেই তাহার শরীরে বার্দ্ধক্য দেখা দিয়াছে। তাহার চেহারা দেখিলে মনে হয় যে তাহার উপর দিয়া অনেক শোক দুঃখের ঝড় বহিয়া গেছে। দুঃখ কষ্টের আঘাতে তাহার মুখখানা এত কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল যে সে মুখে কোনো ভাবের রেখা পড়িত না। কেবল বড় বড় চোখ দুটি সদাই স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল, সরস ও নবীন হইয়া থাকিত ;—তাহার জীবনী-শক্তি, প্রাণের

কোমলতা, কমনীয়তা ঐ চোখ দুটিতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। অন্য সব লক্ষীছাড়াদের সঙ্গে তার ঐখানটায় প্রভেদ।

সে চলিয়াছে। সামনে বন—পিছনে বন। মাঝে মাঝে কেবল দুটি একটি কুঁড়ে ঘরের মাথা গাছপালার উপর জাগিয়া আছে। কিছু পরেই সেই বাড়ি।

বাড়ির সামনে আসিয়াই সে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। কেউ কোথাও নাই। সেই জনহীন স্থানে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহার মনে হইতেছিল সেখানকার জল স্থল আকাশ যা কিছু সবই যেন তাহার নিজের,—আর কেউ মালিক নাই। কিন্তু এ কি? তাহার প্রাণে এ অবসন্নতা কেন? পা চলে না—হাত উঠে না; প্রাণপণ শক্তিতে কে যেন তাহার কাজে আজ বাধা দিতে উঠিয়াছে!

এই তার প্রথম—এর আগে সে কখনো

চুরি করে নাই। দারুণ ক্ষুধার জ্বালায় উৎপীড়িত হইয়া সে মধ্যে মধ্যে পরের বাগানে ফলটা পাকড়টা পাড়িয়া খাইয়াছে বটে কিন্তু কখনো পাঁচিল ডিঙাইয়া, দরজা ভাঙিয়া, সিঁদ কাটিয়া চুরি করে নাই।

তেমন করিয়া চুরি সে করে নাই বটে—কিন্তু কেন করিবে না? কে তাহার মুখের পানে চায়? সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর যখন ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলিতে থাকে, তৃষ্ণায় ছাতি কাটিয়া যায়, তখন কি কেউ এক মুঠা অন্ন, এক ফোঁটা জল তাহার সামনে আনিয়া ধরে? শীত নাই, বর্ষা নাই, গ্রীষ্ম নাই—দিনরাত সে যে খোলা মাঠে পড়িয়া থাকে, মাথা গুঁজিবার ঠাঁই পায় না—শীতে দাঁতে দাঁত লাগিয়া যায়, তাহাতে কেউ কি একবার 'আহা' বলে?

সে অনেক দিনের কথা। বাপ মা হারাইয়া সে যখন প্রথম পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত

তখন গ্রামের এক বুড়ো তাহাকে যত্ন করিয়া নিজের বাড়ি লইয়া গিয়া ঝুড়ি বুনিতে শিখাইয়াছিল। তাহাতেই তাহার গ্রাসাচ্ছাদন একরকম চলিত। সংসারে কোনো বন্ধন ছিল না বলিয়া তাহার স্বভাবটা ছিল ভবঘুরে রকমের—এক জায়গায় স্থির থাকিতে পারিত না। এ গ্রাম সে গ্রাম করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত—কোথাও বাসা বাঁধে নাই, খোলা জায়গায়ই দিন কাটাইত, রাত কাটাইত।

একদিন ভরসন্ধ্যায় এক কূয়ার পাড়ে তাহার সহিত প্রথম দেখা। সেখানে তখন আর কেউ ছিলনা। মেয়েটি কূয়ায় জল তুলিতে আসিয়া সেইখানে বসিয়া জলপান চিবাইতেছিল। সে যে সুন্দরী ছিল তা নয়; কিন্তু সেদিনকার সন্ধ্যায় ম্লানিমা তাহার ম্লান মুখখানিকে, ছলছল চোখ দুটিকে এমন নিরাশ করুণ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিল

যে তাহার উপমা নাই—তাহাতেই সে মুগ্ধ হইয়া গেল।

সেও ছেলেবেলা হইতে বাপ মা হারা, আপনার বলিবার তার কেউ ছিলনা। কখনো সুখের মুখ দেখে নাই। পরের বাড়ি অশেষ লাঞ্ছনার সহিত দাসীবৃত্তি করিয়া জীবন কাটাইত।

ঝড়ের হাওয়ায় ঝরা পাতার মতো এই দুটি প্রাণী এক ঠাঁই আসিয়া মিলিল। এই মিলনই জীবনমরণের মিলন হইয়া উঠিল।

সে যেমন ঘুরিত সঙ্গে মেয়েটিও তাহার মুখ চাহিয়া তেমনি ঘুরিতে লাগিল—কোনো কুণ্ঠা, কোনো দুঃখ বোধ করিল না। হিমে, বর্ষায় রৌদ্রে, অনাহারে অনিদ্রায় নিরাশ্রয়ে, দিন নাই, রাত্রি নাই, উন্মুক্ত আকাশতলে তাহারা দুটি প্রাণীতে হাসিমুখে জীবন কাটাইতে লাগিল—কোথা হইতে যে আনন্দ আসিত কেহ খুঁজিয়া পাইত না।

এমনি করিয়া দিন কাটে। কিছুদিন পরে তাহাদের মধ্যে এক নূতন প্রাণী আসিয়া জুটিল। ছেলেটি দেখিতে বেশ! অমন হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল ননীর মত কোমল দেহ, এমন সুন্দর সুশ্রী ছেলে গরীবের ঘরে কেউ কখনো দেখে নাই। যেন রাজপুত্র!

ছেলেটিকে পাইয়া বাপ মার মনে হইল সে এক অমূল্যনিধি! আনন্দে তাহাদের প্রাণ ভরিয়া উঠিল। এতদিন তাহারা কিছুতে ভ্রূক্ষেপ করিয়া চলে নাই—সংসারে তাহাদের কোনো আকর্ষণ, কোনো বন্ধন ছিল না—মুক্ত বায়ুর মতো তাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত। কিন্তু ছেলেটিকে পাইয়া সংসারটা তাহাদের চোখে যেন কি এক মোহিনী মায়ায়, যাদুকরের খেলায় রূপান্তরিত হইয়া গেল। সহস্র আকর্ষণ তাহাদিগকে বাঁধিতে লাগিল। ছেলেটি কিসে ভালো থাকে, কি করিয়া ভালো খাইতে পরিতে

পায় সেই ভাবনায় তাহাদের চোখে ঘুম ছিলনা।

চারি বৎসর কাটিয়া গেলে ছেলের মা অসুখে পড়িল—তাহাতেই তাহার জীবন শেষ! সকলে বলিল—"দিনরাত পথে পথে ঘুরিয়া হিমে ঠাণ্ডায় রাত কাটাইয়া মা তো মারা গেল—এখন ছেলেটিকে সাবধানে রাখো।"

বাপ সে কথা গ্রাহ্যই করিল না। সে চিরদিন পথে মাঠে কাটাইয়াছে—জীবনের পক্ষে ঘর যে একটা নিরাপদ স্থান তাহা সে বুঝিতই না। আগের মতই সে জীবন কাটাইতে লাগিল। কিন্তু আর সে আনন্দ থাকিল না—প্রাণের মধ্যে একটা দুঃখ বিঁধিয়া রহিল। এখন সে একলা—তার প্রাণের সঙ্গী—তার দুঃখের সাথী চিরদিনের জন্য তাহাকে ছাড়িয়া গেছে।

ছেলেটি ঠিক মায়েরই মতো—যেন একছাঁচে ঢালা—সেই কোঁকড়া কোঁকড়া চুল,

সেই হাসি হাসি মুখ—সেই সব! তার পানে চাহিলে স্ত্রীর শোক তার অনেকটা দূর হইত। প্রাণটা যখন আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিত, তখন সে ছেলেটিকে বুকের মধ্যে নিবিড়ভাবে চাপিয়া ধরিত,—তাহাতে প্রাণটা কিছু ঠাণ্ডা হইত।

তাহার যে অতবড় কঠোর প্রাণ তাহা হইতেও স্নেহের অমৃতধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া শিশুর হৃদয় সিক্ত করিয়া দিত!

তখন সেই শিশু তাহার জীবনের একমাত্র সম্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে নিতান্তই হতভাগ্য! স্নেহের পুতুল জীবনের সম্বল সেই শিশুটিকে সে হারাইল। ছেলেমানুষের শরীরে অতটা অনিয়ম সহিবে কেন? সে কি হিম বর্ষা সহিতে পারে?

ছেলেটি যখন মারা গেল তখন সে হায় হায় করিতে লাগিল—কেন লোকের কথা শুনিলাম না—কেন তার শরীরের যত্ন

পাইলাম না! ছেলেটির যখন সংকার হইয়া গেল তখন তাহার চোখের জল আর বাধা মানিল না—তাহার জীবনে এই প্রথম কান্না! সে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল—কান্না আর কিছুতে থামে না!

এত কাঁদিয়াও তাহার প্রাণ শান্ত হইল না। তাহার মনে হইতেছিল যেন শরীরের সমস্ত রক্ত জল হইয়া চোখ দিয়া বাহির হইতেছে, যেন তার কাছে সমস্ত জগতটা খালি, সব আঁধার; বুকের স্পন্দন থামিয়া গেছে! দিবারাত্র তাহার চোখ দুটি কেবলই বৃথায় ছেলেকে অন্বেষণ করিয়া ফেরে; কিন্তু কোথায় সে? কোথায় সে? কল্পনায় যে তাহার একটী মূর্ত্তি গড়িয়া প্রাণটাকে শীতল করিবে তাহাও সে পারিত না;—তাহার কি চিন্তা-শক্তি আছে? না, কল্পনা আছে? সে যে মনে মনে কিছুই আঁকিতে পারে না, গড়িতে পারে না। তাহার অস্পষ্ট স্মৃতিটুকুও দিন

দিন মুছিয়া যাইতেছে তবে সে কেমন করিয়া—কি দিয়া তাহার স্নেহের পুতলিটিকে প্রাণের সঙ্গে গাঁথিয়া রাখিবে! ছেলেটির এমন কোনো জিনিসও নাই যাহাকে অবলম্বন করিয়া তাহাকে স্মরণে রাখিতে পারে—গায়ের দোলাই, শুইবার কাঁথা যাহা কিছু ছিল তাহাও চিতার সহিত পুড়িয়া ছাই হইয়াছে। অস্তিত্বের সমস্ত চিহ্ন মুছিয়া লইয়া সে তাহার নিকট হইতে চলিয়া গেছে। তবে কি লইয়া সে ভুলিয়া থাকিবে?

এখন হইতে সে একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিল। তাহার মধ্যে যতটুকু কোমলতা ছিল তার কিছুই রহিল না। সে বাঘের মতো ভীষণ হইয়া উঠিল!

তাহার এক বন্ধু একদিন বলিয়াছিল—"পরের বাগানে ফলটা পাকড়টা চুরি করাও যা আর সিঁধ কাটিয়া চুরি করাও তাই—দুয়েতে তফাৎ কি? দুইই চুরি!"

আজ সেই বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়াইয়া তাহার মনে সেই কথাই কেবল জাগিতে লাগিল।

সে একবার ঘাসের উপর হাত পা ছড়াইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। কি জানি কেন, সেই সময় বুক ফাটিয়া চোখের জল বাহির হইতে লাগিল, প্রাণের ভিতরে সে কেমন একটা অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করিতেছিল! কান্নার পর একটু শান্ত হইলে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে বলিতে লাগিল—"আরো পাঁচজনে তো চুরি করে—আমিই বা কেন না করি? কিসের ভাবনা—কিসের ভয়!"

এক লাফে সামনের নর্দ্দমাটা ডিঙ্গাইয়া সে প্রাচীরের তলায় আসিয়া দাঁড়াইল। যতই সে প্রাচীরের দিকে ঘেঁসিয়া যায় ততই তাহার মনে একটা উৎসাহ আসে। শেষে যখন প্রাচীরের গায়ে হাত ঠেকিল তখন আর

মনে কোনো দ্বিধাই রহিল না। তখন এক লাকে সে প্রাচীর ডিঙাইয়া ফেলিল। সামনেই এক ঘরের দরজা—এক মোচড়ে তালা ভাঙিয়া একেবারে ঘরের ভিতরে আসিয়া উপস্থিত!

প্রথমে কিছু দেখিলনা। ক্রমে ক্রমে ঘরের অন্ধকার চোখে সহিয়া আসিলে সেখানকার সব জিনিস তাহার নজরে পড়িল। দেখিয়া সে একেবারে হতভম্ব! ঘরটি বেশ স্নিগ্ধ; রুদ্ধ বায়ু ঝরা ফুলের গন্ধে ভরা! দেওয়ালে অনেকগুলি ছবি। চারিদিকে বহুমূল্যবান আসবাব! এ সব জিনিস সে কখনো চক্ষে দেখে নাই। সেগুলার সামনে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল—মানুষে এ সব লইয়া করে কি—কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? তাহার মনটা ভয়ে বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

এত জিনিস রহিয়াছে তাহার মধ্যে

কোনটি নয় তাহা সে কিছুতেই ঠিক করিতে পারিল না। যতই ভাবিতে থাকে ততই গোলমাল হইয়া যায়। তাহার মনে হইতেছিল সব জিনিসগুলিই যেন তাহাকে সমস্বরে ডাকিয়া বলিতেছে—"ওগো আমায় লও! আমায় লও!" সে এখন কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে লয়! সে যে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেছে!

সামনে একটা তোরঙ্গ, তাহার দিকে সে অগ্রসর হইল। এক টানে তাহার ডালা খুলিয়া ফেলিল। তোরঙ্গর ভিতর বেশি কিছু ছিল না—কতকগুলা কি ছেঁড়া কাগজ ছড়ান ছিল। এক কোণে দুটা সোনার মোহর অন্ধকারে চক্ চক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সেই দুইটা তুলিয়া লইবার জন্য যেমন হাত বাড়াইয়াছে অমনি একটি ছবির উপর তাহার নজর পড়িল। সমস্ত শরীরের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ বহিয়া গেল—শিয়া

উপশিরাগুলা চন্ চন্ করিয়া উঠিল। তাহার প্রাণের মধ্যে আনন্দ, বিস্ময়, আবেগ একসঙ্গে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ছবিটি একটি ছোট ছেলের! কল্পনায় যে ছবি আঁকিতে গিয়া সহস্রবার ব্যর্থ হইয়া কেবল ব্যথাই পাইয়াছে আজ সেই ছবি চোখের সামনে দেখিয়া সে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। নিমেষের মধ্যে সমস্ত ভুলিয়া গেল। কি করিতে আসিয়াছে, কোথায় আসিয়াছে, কোনো খেয়াল রহিলনা—বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া একদৃষ্টে কেবল ছবির পানে চাহিয়া রহিল। সেই মন ভোলানো মুখ, সেই কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, সেই ফ্যাল্ ফ্যাল্ চাহনি, ঠোঁটের আগায় সেই মধুর ফিক্‌ফিকে হাসি—সেই সব—একেবারে হুবহু ঠিক!

সে যে কোন্ ছেলের ছবি তার ঠিক নাই কিন্তু তার মনে হইল সেটি তার নিজের



ছেলেরই ছবি! তার মন কিছুতেই মানিতে চাহিলনা যে সে পরের ছেলে! এতদিন তাহার প্রাণ যাহা পাইবার জন্য আকুল হইয়া কাঁদিতেছিল আজ তাহা লাভ করিয়া সে পরম তৃপ্তি লাভ করিল—তাহার সমস্ত দুঃখ, সমস্ত অভাব যেন নিমেষের মধ্যে ঘুচিয়া গেল! ছেলের একটা স্মৃতিচিহ্নের জন্য সে লালায়িত হইয়া ফিরিয়াছে; এখন তাহা হাতের মধ্যে পাইয়া আনন্দে দিশাহারা হইল। ছবিটি বুকে করিতেই তাহার মনে হইল যেন ছেলেটিকে সে ফিরিয়া পাইয়াছে, বুকের মধ্যে যেন সে তাহার অঙ্গের তপ্ত স্পর্শ স্নিগ্ধ নিশ্বাস অনুভব করিতেছে।

সে আর বিলম্ব করিল না। ছবিখানি আঁকড়াইয়া ধরিয়া বারম্বার চুম্বন করিল; তাহার পর বুকের মধ্যে লুকাইয়া লইয়া সেখান হইতে প্রাণপণে ছুট দিল।

এই চুরি তাহার প্রথম চুরি—শেষ

চুরিও বটে! আর তাহার মনে চুরির লোভ রহিল না—তাহার যে আর কোনো অভাবই নাই!

কিসমৎ

(১)

বোগদাদ্ সহর আজ উৎসবময়—আলোক-মালায় সজ্জিত, গীতবাদ্যে মুখরিত!

বৃদ্ধ বয়সে হারুন-অল-রশিদের সখ হইল বাল্যকালের বন্ধুবান্ধব ও তাবৎ আমির ওমরাহকে একটা বড়গোছের ভোজ দিয়া একত্র করেন। জাফর উজির আটদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তাহার আয়োজন করিয়াছেন। রাজপ্রাসাদ আলোয়-আলোয়, ফুলে-ফুলে, ভরিয়া উঠিয়াছে; গুলাব আতরের গন্ধে দিক আমোদিত!

একে একে নিমন্ত্রিতেরা আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। ভোজ আরম্ভ হইবে। এমন সময়, উজির হাঁপাইতে হাঁপাইতে কালিফের ঘরে উপস্থিত। তাঁহার দেহ বেতসপত্রের মতো কাঁপিতেছে—মুখে চিন্তার কালো ছায়া!

উজিরকে এই অবস্থায় দেখিয়া কালিফ বিস্মিতভাবে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"উজির সাহেব ! ব্যাপার কি ?"

উজির কম্পিত হস্তে সেলাম করিয়া অস্ফুট কণ্ঠে কহিলেন—"জাঁহাপনা ! নোকরকে ছুটি দিন। আমি আর এক-মুহূর্ত্ত এখানে থাকতে পারবো না। আজ রাত্রে—এখনই আমাকে সিরকসে যেতে হবে !"

কালিফ্ ব্যগ্র হইয়া কহিলেন—"কেন ? কি হয়েছে ?"

উজির কহিলেন—"কারণ আছে।"

কালিফ্ কহিলেন—"খুব জরুরি কারণ থাকলেও তো আজ তোমায় ছাড়তে পারিনে উজির সাহেব !—তোমারই উপর যে উৎসবের ভার ! তুমি চিরদিনের বন্ধু, তুমি উপস্থিত না থাকলে কি চলে ?"

উজির অধীর হইয়া কহিলেন—"মাপ

করুন খোদাবন্দ—এ গরীবের ছুটি মঞ্জুর করতেই হবে—যোড়হাত করে বলচি!”

কালিফ্ কহিলেন—“কেন বল দেখি? কিসের এত তাড়া?”

উজির কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—“তবে শুনুন জনাব! মৃত্যুর দূত এসেচে। তাকে এইমাত্র আমি এই বাড়ির মধ্যে দেখেচি, সে আমার দিকে বার বার কটাক্ষ করচে, আমাকেই সে খুঁজচে। এখনই যদি পালাতে না পারি আমার মৃত্যু নিশ্চয়! এত আনন্দ উৎসব আমার জন্য নষ্ট হবে?”

একথা শুনিয়া কালিফ্ বলিলেন—“এমন যদি হয় উজির সাহেব, তাহলে তোমার ছুটি—তুমি এখনি পালাও! খোদা তোমার রক্ষা করুন!”

মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া সেই অন্ধকার রাত্রে উজির প্রাসাদ ছাড়িয়া পলাইলেন।

(২)

ভোজ শেষ হইয়া গেছে কিন্তু কালিফ্ অবসন্ন দেহে শয়ন কক্ষে বসিয়া আছেন। হঠাৎ দেখিলেন, সম্মুখে মৃত্যুর দূত! কালিফ্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কেন এখানে?"

কালিফকে সেলাম করিয়া সে উত্তর করিল—"উজিরের সন্ধানে!"

কালিফ্ একটু হাসিয়া কহিলেন—"উজির তো এখানে নেই—এইমাত্র সে ছুটি লইয়া সিরকাসে গেছে।"

মৃত্যুর দূত নিশ্চিন্ত হইয়া কহিল,—"খোদাবন্দ! ঠিক হয়েছে! কাল ভোরে সেখানেই মৃত্যু তাঁর নিয়তি। এখন আমিও চলি, খবর দিইগে তাঁর জীবনের ছুটিও মঞ্জুর!"

কালিফ্ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া কহিলেন—"কিসমৎ!"

চীনদেশের কাজি

য়ুনান হইতে প্রতি বৎসর যে সদাগরের দল ঘোড়ার পিঠে লোহার সাসন, সোনার পাত, আখ্‌রোট, হরিতাল, উটের কম্বল, ঘাসের টুপি প্রভৃতি নানা জিনিস বোঝাই করিয়া বাণিজ্য করিতে বাহির হইত, সাইসিয়ুং সেই দলের সওয়ার ছিল। এই দল ঠিক বর্ষার পরেই শান্‌ প্রদেশে আসিয়া হাজির হইত—সমস্ত দেশটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সওদা করিত, তারপর তুলা, আফিম্‌ প্রভৃতি কিনিয়া লইয়া গ্রীষ্মের শেষে স্বস্থানে ফিরিয়া যাইত।

এই ভাবের জীবনযাপন কখনই সুখের নয়। কোনো রকমে নাকে মুখে গুঁজিয়া সকাল সাতটা বাজিতে না বাজিতে যাত্রা আরম্ভ, বারোটা-একটা বাজিলে ঘোড়ার পিঠ হইতে জিনিসপত্র নামাইয়া গাছের ছায়ায় বসিয়া

একটু শ্রান্তিদূর, তার পর আবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলা। এর মধ্যে কোথাও জল লইবার আবশ্যক হইলে এক আধবার দাঁড়ানো হয়; নচেৎ একদমে চলিতে থাকে। শেষে, বাজারে আসিয়া পড়িলে জিনিসপত্র কেনা-বেচার সময় যা একটু বিশ্রাম।

রাস্তা যদি ভালো থাকে তবে প্রতিদিন ক্রোশ পনেরো হাঁটা হয়। পাহাড়ে রাস্তা হইলে চড়াই উৎরাই ভাঙিতে, শিশিরে ভেজা পিছল রাস্তা চলিতে অনেক সময় লাগে, সেই জন্য দশ ক্রোশের বেশি একদিনে চলা হয় না। রাত হইলে, মাটির উপর খড়-কুটা বিছাইয়া তার উপরে কম্বল পাতিয়া সকলে শুইয়া পড়ে।

দলের যিনি সর্দ্দার তিনিই কেবল ঘোড়ায় চড়িয়া চলেন, আর সকলকে হাঁটিয়া যাইতে হয়। এই দলের সর্দ্দার ছিল—চু-কো-লিয়াং। য়ুনানের সবচেয়ে কড়া মদ যে গ্রামে তৈরি হয়

সেই গ্রামে ইহার জন্ম। জানি না সেই কারণে কিনা, লোকটা ভয়ানক মাতাল ও বদরাগী ছিল। মদ খাইয়া সে যখন মুখ লাল করিয়া বসিয়া থাকিত তখন কাছে যায় কার সাধ্য!

একদিন ঐ বণিকদল এক পাহাড়ে রাস্তা ভাঙিয়া চলিয়াছে, সাইসিয়ুংএর ঘোড়াটা হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল—তার পিঠের আসবাব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং দু চারিটা জিনিস গড়াইয়া পাহাড়ের নীচে খদে কোথায় চলিয়া গেল।

চু-কো-লিয়াং দলের আগে আগে ঘোড়ার পিঠে চলিতেছিল—দল ছাড়িয়া সে অনেকটা দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। কাজেই তাহার কানে এই দুর্ঘটনার কথা তখন গেল না; সন্ধ্যাবেলা সে যখন ঘোড়া হইতে নামিয়া রাত কাটাইবার জন্য জায়গা খুঁজিতেছিল তখন পিছন হইতে তাহার দল আসিয়া পৌছিল।

তাহাদের মুখে জিনিস খোওয়া যাওয়ার কথা শুনিয়া সে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল! নেশায় তখন সে ভরপুর—মাথার ভিতরটা ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। মুখে যা আসিল তাই বলিয়া সাইকে গালি দিল। সাই এই গালি পরিপাক করিতে পারিল না, তাহারও মেজাজ চড়িয়া উঠিল, সেও যা-ইচ্ছা-তাই বলিয়া গালি দিল! তুমুল ঝগড়া বাধিয়া উঠিল। রাগে চু-কো-লিয়াং কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইল। ঘোড়ার পিঠে চামড়ার থলিতে তার একটা পিস্তল থাকিত, সে সেই পিস্তলটা বাহির করিতে গেল। সাই তখন বেগতিক দেখিয়া চম্পট দিল। পিস্তলের থলিটা কাঁচা চামড়ার তৈরি—চামড়াটা শুকাইয়া গিয়া পিস্তলটাকে গিলিয়া ধরিয়াছিল—কিছুতে বাহির হইতে দিতে চাহিতেছিল না। চু টানাটানি করিতেছিল। সেই অবসরে সাই অনেকটা দূর পলাইয়া গেল। পিস্তল যখন

বাহির হইল তখন লিয়াং চাহিয়া দেখে সাই দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেছে।

সাই ছুটিয়া চলিতেছিল। বনের মধ্যে অনেকদূর গিয়া যখন দেখিল পিছনে কেউ তাড়া করিয়া আসিতেছে না তখন সে এক গাছের তলায় গিয়া বসিল—রাতের অন্ধকার তখন ঘোর হইয়া নামিয়া আসিয়াছে।

সাই বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। এখন কি করা যায়? দলের লোকেরা যেখানে আড্ডা গাড়িয়াছে সেখানে পথ চিনিয়া ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া আজ রাত্রে চু-লিয়াংএর সামনে যাওয়া আর বাঘের মুখে যাওয়া একই কথা।

পাহাড়ের গা বাহিয়া এক সুঁড়ি পথ নামিয়া গিয়াছে। সাই সেই পথ ধরিয়া চলিল। কিছু দূর চলিয়া পাহাড়ের তলায় এক ছোট গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সে গ্রামে কেবল চাষাদেরই ঘর; তাহারা

শুধু তুলার চাষ করে। চীনে ব্যবসাদারেরা প্রতি বৎসর তাহাদের ঘর হইতে অনেক টাকার তুলা কিনিয়া লইয়া যায়। সাই তাহা জানিত। সে এক চাষার কুটীরে প্রবেশ করিয়া নিজেকে এক মহাজনের গোমস্তা বলিয়া পরিচয় দিল। বলিল, দলভ্রষ্ট হইয়া পথ হারাইয়া সেখানে আসিয়া পড়িয়াছে।

চাষা যখন শুনিল সে একজন তুলা-ব্যবসায়ীর লোক তখন তাহাকে খুব আদর করিয়া নিজের কুটীরে থাকিতে বলিল। ভাবিল, লোকটাকে হাতে রাখা ভালো—সময়ে উপকারে লাগিবে!

সাই ভাবিয়াছিল রাত পোহাইলে পথ খুঁজিয়া নিজেদের দলে গিয়া জুটিবে। কিন্তু রাত্রের মধ্যেই সে জ্বরে পড়িল। সাতদিন বেহুঁস হইয়া রহিল। যখন জ্ঞান হইল তখন তাহাদের দল কতদূর চলিয়া গেছে—আর সন্ধান করা বৃথা! কাজেই যেখানে ছিল

সেইখানেই থাকিয়া গেল। চাষা পাহাড়ে থাকিত বটে কিন্তু তাহার হৃদয়টা পাথরের মতো কঠিন ছিল না। অতিথিসেবায় তাহার আনন্দ বই কষ্ট ছিল না—সে সাইকে অতি যত্নে পুষিতে লাগিল। সাই মধ্যে মধ্যে চাষাকে স্তোকবাক্যে ভুলাইত। বলিত, তাহার তুলা যে চীনদেশের বাজারে খুব চড়া দরে বিকাইয়া দিতে পারে এমন ক্ষমতা তাহার আছে। চাষা যে এই সব উড়ো-কথায় ভুলিত না তাহা নহে। ভবিষ্যতে একটা বড় গোছের দাঁও মারিবার আশায় সে বেশ আনন্দের সহিত সাইয়ের ভরণপোষণ বহন করিতেছিল।

সাইয়ের অনেক গুণ ছিল। তাহার কথায় এমন বাঁধুনি ছিল যে সহজে লোক বশ হইয়া যাইত। কয়েকজন চাষাকে রাজি করাইয়া সে সেই গ্রামে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিল। চাষাদের নিকট হইতে তুলা লইয়া গিয়া সে চীনে মহাজনদের নিকট বিক্রয় করিয়া

আসিত, এবং চাষাদের নিকট হইতে লাভের কিছু অংশ গ্রহণ করিত। এইরূপ করিয়া সেই গ্রামের মধ্যে সে বেশ জমিয়া বসিল। অল্পে অল্পে অর্থ সঞ্চয় হইতে লাগিল, এবং গ্রামের মোড়ল-কন্যার সহিত তাহার বিবাহও হইয়া গেল। তখন সে নিজে কিছু জমী কিনিয়া চাষ আরম্ভ করিয়া দিল। দিনে দিনে তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকিল।

কয়েক বৎসর পরে তাহার একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। ছেলেটির যখন বয়স চার বৎসর তখন সাহেবের ভাবনা হইল কি করিয়া ছেলেটির লেখাপড়ার ভালো বন্দোবস্ত করে। সেই গ্রামে কেবল নিরক্ষর পাহাড়ী লোকের বাস;—সেখানে কোনো পাঠশালা ছিলনা,—তাহারা লেখা-পড়ার ধার ধারিত না। গোটাকতক মঠ আছে তাহাতে লিখিতে ও পড়িতে শেখানো হয় বটে কিন্তু সেগুলোর উপর সাহেবের কোনো

শ্রদ্ধা ছিলনা—কারণ সে শুনিয়াছিল যে মঠের পুরোহিতরা বামদিক হইতে ডানদিকে একটানে লিখিয়া যায়;—কি অদ্ভুত!

সাই নিজে লেখাপড়া শেখে নাই সেকথা সত্য, কিন্তু তাহার অবস্থা যখন ভালো হইয়াছে তখন তাহার ছেলে লেখাপড়া না শিখিলে কি চলে? সে জানিত বড় ঘরের ছেলে মাত্রই লেখাপড়া শেখে, এবং তাহাদের শিখিবার উপযোগী একটি মাত্র ভাষা আছে, তাহা চীন ভাষা! ছেলেকে যদি শিখাইতে হয় তাহা হইলে এই চীন ভাষা শেখানোই উচিত—কারণ তার ছেলে এখন বড় ঘরের ছেলেরই মত যে! কিন্তু এ গ্রামে সে ভাষা শিখাইবে কে? চীন মুলুকে না গেলে তো হইবে না! সেখানে যাইতে ক্ষতি কি? সে তো তাহার স্বদেশ। তা ছাড়া তাহার এখন বেশ দুপয়সা জমিয়াছে—নিজের গ্রামে গিয়া এখন সে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই থাকিতে পারে,

এবং ছেলের লেখাপড়ারও ভালো বন্দোবস্ত হয়। এই স্থির করিয়া সে স্ত্রীকে বলিল —লা-টি! আমি মনে করছি, এইবার চীন মুলুকে ফিরে যাবো।

এই কথা শুনিয়া স্ত্রীর মন বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া গেল। সে চোখ দুটা বড় করিয়া বলিল—চীন মুলুক! সে কোন্ দেশ? কত বড়? এখানকার চেয়েও বড় জায়গা নাকি!

সাই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল—কি কথাই বল্লে! এখানকার চেয়ে বড় নাকি! চীনদেশ ছেড়ে দিলে পৃথিবীতে আর বড় জায়গা থাকে না, জানো। আমাদের ঐ তূলোর ক্ষেতের ধারে খানার গায়ে শেওলা ফুটেছে দেখচো— চীনদেশটা ঐ প্রকাণ্ড তূলোর ক্ষেত আর তোমাদের এই গাঁ ঐ শেওলার একটা পাপড়ি। কত তফাৎ বুঝলে? আর বেশি

দিন নয়, শীঘ্রই সে দেশ চোখে দেখবে—তখন বুঝবে—বুঝবে !

লা-টি অবাক হইয়া গেল। সে বলিল—যাই বল বাপু, ওসব বড় বড় জায়গা আমার ভালো লাগে না। দু দুবার আমি সহরে গেছি ;—ছ্যাঃ, তেমন জায়গায় মানুষে থাকে! বাড়িগুলো এমনি ঘেঁসাঘেসি, আর এত বড় বড়! লোকগুলো ভারি বেহায়া—কেবল মুখের পানে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। রাস্তাগুলো—আরে ছ্যাঃ—ধুলোয় কাদায় ভরা; আমি তোমাদের ও চীনদেশে যাচ্ছি না। আচ্ছা—শুনি, যেতে কত দিন লাগবে ? —খুব দুর নাকি ?

লাই বলিল—তুমি নেহাৎ গাধা দেখচি। তোমাদের এখানকার যে সহর সেখানকার অজ পাড়াগাঁয়ের কাছেও তা ঘেঁসতে পারেনা। সেখানকার বাড়ি কী! এখানকার মতো এই মাটির মনে করচ না কি! তা নয়। ইঁট

দিয়ে পাথর দিয়ে গাঁথা বড় বড় সব ইমারৎ। লম্বা লম্বা ঘর! এই ফটক—আকাশে মাথা ঠেকচে। বাড়ির সামনে ফুলের বাগান। চাকরবাকর হৈ হৈ করচে। রাস্তাঘাট চকচকে পাথরে বাঁধানো, ঝর ঝর করচে—ছুঁচ পড়লে খুঁটে নেওয়া যায়। দেখবে—দেখবে—সবই দেখবে—রোসো না। ভালো ভালো সব পাঠশালা আছে সেখানে ছেলেকে পড়তে দেবো, লেখাপড়া শিখে তোমার ছেলে যখন রুজিরোজগার করবে তখন বুঝতে পারবে কেন সে দেশে যাচ্ছি।

মা-টি চটিয়া উঠিয়া বসিল—খালি বক্ বক্ করচো! যেতে কত সময় লাগবে সেই কথা আগে বলনা।

—যেতে লাগবে ক দিন?—বেশি দিন না, এই হদ্দ মাস দুই। তা তোমার কোনো কষ্ট হবেনা—দিব্যি পাল্কি চড়ে যাবে।

—বাবারে! দু—মাস! আমি যাচ্চিনা।

তোমার খুসি হয় তুমি যাও। আমি যেখানে আছি সেইখানেই থাকবো। তোমার ও ইঁটের ইমারৎ, পাথরের রাস্তা আমি দেখতে চাইনা—আমার এ মাটির ঘর, পাহাড়ে রাস্তাই বেশ!

—যাবে না বই কি! ছেলে মানুষ করবে কে? এখানে থাকলে ছেলেটা তো তোমার মত মুখ্যু হয়ে থাকবে—সে হচ্ছেনা বাপু। ছেলেকে জজ না করে আমি ছাড়ছিনা”।

এই কথায় মা-টি বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। সে বলিল—মারো, কাটো, যাই করো আমি সেখানে কিছুতে যাবোনা। তুমি আমায় জোর করে নিয়ে যাবে? মনে নেই বিয়ের সময় কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে?” —আমাকে কখনো এখান থেকে কোথাও নিয়ে যাবে না। এখন ভবে এ কী বলচো! গ্রামসুদ্ধ লোককে মদ খাওয়ানো

হোলো, দশটা শূয়োর পাঁচটা মুরগী জবাই হোলো, তবে তো আমাদের বিয়ে হয়েছে। সেই বিয়েতে যে প্রতিজ্ঞা করেছো, সে প্রতিজ্ঞা তুমি রাখবে না! এত বড় পাষণ্ড তুমি! পাপের ভয় নেই? যে দেশের নাম আমি জানিনা, যে দেশ চক্ষে কখনো দেখিনি, যেখানকার লোক আমায় চেনে না, যেখানকার লোককে আমি চিনি না, সেই দেশে তুমি আমায় নিয়ে যাবে? তোমার অধর্ম্মের শেষ থাকবেনা যে!

সাই বলিল—আমার ধর্ম্ম, আমার অধর্ম্ম আমি বুঝবো, তোমায় আর মুখনাড়া দিতে হবেনা। ধর্ম্মের কথা, শাস্ত্রের কথা তুমি মেয়েমানুষ কি জানো! শাস্ত্রে বলেছে স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র মালিক। আমার ঘোড়াকে যেমন যেখানে খুসি নিয়ে যেতে পারি, স্ত্রীকেও তেমনি পারি। দুষ্টুমি করলে ঘোড়ার পিঠে যেমন চাবুক কসাই, স্ত্রীর

পিঠেও তেমনি কসানো যায়—শাস্ত্রে একথাও বলেছে। তোমার ওসব কথা আমি শুনবোনা। তোমায় যেতেই হবে। দেখো, ফের ভালমানুষি করে বলছি—চল এই বেলা। সেখানে গেলে তোমার আর ফিরতে ইচ্ছে করবেনা—দেখো আমার কথা সত্যি কি না!

লা-টি দৃঢ়স্বরে বলিল—আমি যাবো না।

সাই সেই কথা শুনিয়া ভয়ানক চটিয়া উঠিল। বলিল—তবে এইখানে মরতে পড়ে থাকো। আমি ছেলে নিয়ে চল্লুম!

লা-টি স্বামীকে ছাড়িয়া দিতে পারে কিন্তু ছেলেটিকে কোল-ছাড়া করিতে পারেনা। সে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—আমার ছেলে আমার কাছে থাকবে।

সাই বলিল—কিছুতে না।

লা-টি এই কথা শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সার কাছে আসিয়া হাজির। তাহাকে সকল কথা

ফুঁপিয়া বলিয়া বলিল—আমি যেতে চাইনে বলে, মা, আমায় যা-না-তাই বলচে!

লা-ট্টর মা বুড়ি। তার বয়সে সে অনেক দেখিয়াছে। সে বলিল—বাছা! শুধু বকুনিতেই এই! এখনো তবু পিঠে লাঠি পড়েনি! আমি বরাবর দেখে আসচি, স্বামীর কাছে মার খেতে খেতে স্ত্রীর হাড়গোড় আস্ত থাকে না;—এই তো এখানকার রীত! তোর ভাবি ভাগ্যি যে তোর গায়ে এখনো লাঠি পড়েনি। তুই তো সুখেই আছিস, গায়ে গয়না গাঁটি পরেছিস, রাজার হালে আছিস। তোকে জলও তুলতে হয় না, ঘরও ঝাঁট দিতে হয় না। এই দেখ্ না বাপু, আমি তো এ গাঁয়ের মোড়লের গিন্নী, খাটতে খাটতে আমার জিব বেরিয়ে আসে। এই বুড়ো বয়সেও আমাকে বাজরা মাথায় হাটে সওদা করতে যেতে হয়। তুই তো দিব্যি পায়ের উপর পা দিয়ে আছিস। পাল্কি

চড়ে বেড়াস, আর গাঁয়ের লোকের সঙ্গে কোঁদল করিস! তোর স্বামীর মতো স্বামী কজন পায়? সে তোকে কত সুখে রেখেছে বল্ দেখি। তার কথা তুই মানবিনে? না মানিস নিজেই ভুগবি। এইখানে একলা পড়ে থাকিস্! তোর দুঃখে তখন শেয়াল কুকুর কাঁদবে! আমি কি করব?

মায়ের কথা লা-টির ভালো লাগিল না। সে ভাবিয়াছিল মা স্বামীর কার্যে প্রতিবাদ করিবে, কিন্তু তাহাকে স্বামীরই পক্ষ লইতে দেখিয়া তাহার দুঃখ উথলিয়া উঠিল! সে তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বাপের কাছে গেল।

বাপ ক্ষেতে জমি চষিতেছিল। ক্ষেত অনেক দূরে এক পাহাড়ের উপরে। লা-টি সেইখানে হাঁটিয়া চলিল। চলার পরিশ্রমে ও রৌদ্রের তাপে সে শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়িল। অবশেষে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাপের কাছে আসিয়া তাহাকে সকল কথা বলিল। বাপ

সে সকল শুনিয়া উত্তরে যাহা বলিল তাহা লা-টির আদপেই মনের মতো হইল না। বাবা বলিল—বাবার যখন মন করছে তখন সে যাবেই, তাকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না। তুই না যাস্ পড়ে থাকবি। ছেলেকে সে কখনই এখানে রেখে যাবে না, সঙ্গে করে নিয়ে যাবেই। ছেলে ছেড়ে যদি না থাকতে পারিস তো তোকেও সঙ্গে যেতে হবে। আর এখানে যদি থাকিস তাহ'লে বিয়ের আগে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যেমন ক্ষেতে কাজ করতিস, তেমনি করবি। আমি তো আর বসিয়ে বসিয়ে খেতে দিতে পারবো না।

লা-টি ভাবে নাই তাহার বাপ মা এমন নির্দ্দয়ের মতো কথা বলিবে। সে ভাবিয়াছিল তাহারা নিশ্চয়ই স্বামীকে গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে বাধা দিবে। এখন সে অকূল পাথারে পড়িল। এক গাছের তলায় বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। সামনে একটা ক্ষেতে

কতকগুলি চাষার মেয়ে কোমর বাঁধিয়া জমিতে নিড়েন দিতেছিল, পরিশ্রমে ও রৌদ্রের তাপে তাহাদের মাথার ঘাম পায়ে পড়িতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া লা-টির মন ছাঁৎ করিয়া উঠিল।—এখানে থাকিলে দুদিন বাদে তাহারো অবস্থা ঐরূপ হইবে। বাপ রে তার চেয়ে মরা ভালো! সে তখন তুলনায় সমালোচনা করিয়া বুঝিতে পারিল তাহার স্বামী তাহাকে কত সুখে রাখিয়াছে। সেখান হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে সে তখন স্বামীর ঘরে ফিরিয়া গেল। অভিমানে ও আত্মগর্ব্বে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না বটে কিন্তু মনে মনে ঠিক করিল স্বামীর সহিত চীন মুলুকে যাইবে। স্বামীও আর উচ্চবাচ্য করিল না। বারম্বার যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া সে স্ত্রীর কাছে নিজেকে হেয় করিতে চায় না। সে ঠিক করিল স্ত্রীকে এইবার দেখাইবে যে, সে না থাকিলেও তাহার

দিন চলে—তাহাকে সঙ্গে লইতে সে তত ব্যস্ত নয়।

দুই জনে এইরূপ চুপ্‌চাপ্‌ রহিল। শেষে যাইবার দিন যখন পাল্কি আসিয়া হাজির, তখন লা-টি ছেলেটিকে বুকে লইয়া আস্তে আস্তে পাল্কিতে চাড়িয়া বসিল—কোনো কথা বলিল না।

দু'দিনের পথ চলিবার পর তাহাদের সঙ্গে এক বণিকদলের দেখা।—তাহারাও চীন-দেশের যাত্রী। সেই দলের যে সর্দ্দার তার নাম ছিল লি। এখানকার পথঘাট লি'র মুখস্থ। সে বৎসরে বহু বার এখান দিয়া যাতায়াত করে। এখানকার নিয়মকানুন, আচারব্যবহার কিছুই তাহার অবিদিত ছিল না।

লোকটাকে দেখিলে তাহার বয়স সহজে ঠাহর হইত না। শরীরের প্রতি অত্যধিক কুৎসিত অত্যাচারে তাহার দেহে অকাল

বার্দ্ধক্য আসিয়াছিল। মনের মধ্যে সদাই বদমাইসি খেলিতেছে। লোকটা বাহিরে দেখিতে মোলায়েম কিন্তু অন্তরে ভয়ানক কুটিল। মুখের ভাবে সে নিজের স্বরূপ ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। দেখিলেই বোধ হইত খুব স্ফূর্তিবাজ;—সদাই মুখে হাসি, গান, গল্পগুজব, ঠাট্টামস্করা লাগিয়াই আছে। এমন সব মজার মজার চুটকি গল্প বলিতে পারিত যে লোকেরা হাসিয়া খুন হইত। গলাও বেশ মিষ্ট;—গান গাহিয়া লোককে মুগ্ধ করিতে পারিত। যে তাহার সঙ্গে মিশিত সেই বেশ একটা আমোদ পাইত। পথ-চলার পক্ষে এমন একটা সঙ্গী বড়ই উপাদেয়। সাই তাহাকে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইল।

সাই ও লি ঘোড়ার পিঠে আগে আগে চলিতেছিল, পিছনে লা-টি ছেলেটিকে লইয়া ঘেরাটোপ-ফেলা পাল্কি চড়িয়া যাইতেছিল।

লির নজর লা-টির পাল্কির উপরে। বাতাসে যেমন পাল্কির ঢাকা এক একবার উড়িয়া যায় অমনি লি লা-টিকে আড়চোখে দেখিয়া লয়। লি দেখিল লা-টির চেহারা মন্দ নহে; গায়ে বেশ ভারি ভারি গহনাও আছে। স্বামীর সহিত লা-টির যে মনের মিল নাই তাহা তাহাদের পরস্পরের ব্যবহারে লি শীঘ্রই বুঝিতে পারিল। সে ভাবিল বাঃ, বেশ তো! বেশ একটা সুযোগ জুটিয়াছে! সে তখন পাল্কির খুব কাছ ঘেঁসিয়া ঘোড়া চালাইতে লাগিল এবং সুবিধা বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে গুন্‌গুন্ সুরে ছোট একটি প্রণয় সঙ্গীত ছাড়িতে লাগিল! প্রথমে সে লাটির দিকে আড় নজরে চাহিতে-ছিল এখন বেশ স্পষ্টভাবে কটাক্ষপাত করিতে আরম্ভ করিল। সে চাহনিতে লা-টিও যে ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল, তাহা নহে। সন্ধ্যার বাতাসে বাঁশির সুরের মতো লির গুন্‌গুন্ গান ভাসিয়া আসিয়া তাহার প্রাণটাকে

উদাস চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল! গানের সব কথা সে বুঝিতেছিল না বটে কিন্তু সুরের মধ্যে কাহার প্রাণের একটা প্রচ্ছন্ন প্রণয়-আবেগ তাহার স্বামীর-প্রতি-বিরূপ-মনটাকে কোন্ এক অজানা পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। লির সেই বিহ্বলতা মাখা কটাক্ষের মধ্যে এমন একটা নিগূঢ় প্রলোভন ছিল যার আকর্ষণ কাটাইয়া তোলা লাটির পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল সেও অমনি করিয়া লির দিকে চাহে! এবং চাহিতেও লাগিল।

রাত্রে, এক চটিতে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেখানে রাত্রিযাপনের পর সকালে বাহির হইয়া সমস্তদিন চলিয়া সন্ধ্যার সময় আর এক চটিতে থামিল। এই ভাবে চারি দিন কাটিয়া গেল। এর মধ্যে লির কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না ;—সে যেমন গান গাহিতে গাহিতে, গল্প করিতে

করিতে এবং লা-টির উপর কটাক্ষ করিতে করিতে আসিতেছিল, তেমনি আসিতে লাগিল। লা-টিও আগের মতো তেমনি ভাবে তাহাকে প্রশ্রয় দিতে লাগিল। তাহার গান যে লাটির কানে ভালো লাগে, এবং গল্পগুলো যে অন্তরের সহিত উপভোগ করিতেছে এমন আভাস দিতে সে ছাড়িল না। এমনি করিয়া দু'জনের অন্তরে প্রেমের ফল্গু বহিতে লাগিল।

পাঁচ দিনের পর তাহারা সান্ রাজ্যের সীমানায় আসিয়া পৌঁছিল। এইখানে কতকগুলো চীনে ধরণে ছোটোখাটো পান্থনিবাস আছে, তাহারই একটাতে তাহারা আশ্রয় লইল। তখন প্রায় সন্ধ্যা। লি তাহার আসবাবপত্র ও ঘোড়াগুলা কোথায় রাখিবে সেই ব্যবস্থা করিতে গেল, সাই স্ত্রীপুত্রকে লইয়া পান্থনিবাসের একটা ঘরে প্রবেশ করিল।

লা-টি গোঁ হইয়া আছে—কথা কহে না,—মুখে প্রসন্নতা নাই। সাই যতই স্ত্রীকে কথা কওয়াইবার চেষ্টা করে সে ততই বাঁকিয়া বসে। সাইও ততই চটিয়া উঠে। শেষে আর কোনো কথা না কহিয়া সাই বিরক্তির সহিত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মনে ভাবিল বাহিরে একটু বেড়াইয়া মনটা ঠাণ্ডা করিয়া আসি। লা-টি একলা সেই ঘরে পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকিয়া লি সেইখানে প্রবেশ করিল।

সাই যখন ফিরিল তখন রাত হইয়াছে। সে একেবারে সটান্ স্ত্রীর ঘরে গেল। যেমন সেখানে যাওয়া অমনি লা-টি চীৎকার করিয়া উঠিল—ওগো কে আছো রক্ষা করো—খুন করলে, মেরে ফেল্লে,—ডাকাত! ডাকাত! লি! লি!—শীঘ্র এসো!

সব কথা শেষ না হইতেই লি সবেগে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। এমন ভাবে আসিল

যে মনে হইল যেন এতক্ষণ বাহিরে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া সে লাটির এই চীৎকারধ্বনির অপেক্ষা করিতেছিল। সে প্রথমেই সাইয়ের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—তুই পাগল, না মাতাল? রাত্রিবেলা আমার স্ত্রীর ঘরে ঢুকেচিস্। এত বড় স্পর্দ্ধা তোর! বেরো এখনি—নইলে গলাধাক্কা দিয়ে বার করবো।

সাই অবাক হইয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল—মুখ দিয়া কথা সরিল না।

পান্থনিবাসের কর্ত্তা, চাকর-খানসামা প্রভৃতি গোলমাল শুনিয়া সেখানে ছুটিয়া আসিল এবং তাহাদের সকলকে গোল-করিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। লি তাহাদিগকে শুনাইয়া শুনাইয়া জোর-গলায় বলিতে লাগিল—বের করে দাও—ওকে বের করে দাও। হাঁ কোরে দেখচো কি? এমনি কোরে তোমরা পাগল মাতালকে এখানে জায়গা দাও—যাদের দৌরাত্ম্যে ভালমানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত!

পান্থনিবাসের কর্তা মাথা চুলকাইয়া কহিল—ও তো আপনাদেরই দলের লোক মশায়—আপনাদেরই সঙ্গে তো এসেছে!

লি বলিল—আরে মোলো, আমাদের সঙ্গে এসেছে বলেই কি আমাদের দোষ! তা হলে কি তোমরা পাগল মাতাল নচ্ছার লোকদের এখানে জায়গা দেবে? ভদ্রঘরের মেয়েদের কি এখানে আবরু নেই? এখনি ও মাতালটাকে তাড়াও বলচি, নইলে ও যে রকম করে আমার দিকে চাইছে, তাতে নিশ্চয় আমাকে ওর খুন করবার মতলব আছে!

স্যাই রাগে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। সে ছুটিয়া গিয়া লিকে আক্রমণ করিতে গেল। পান্থনিবাসের লোকেরা তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল এবং অনেক ধস্তাধস্তির পর তাহাকে বাড়ির বাহির করিয়া ফটক বন্ধ করিয়া দিল। স্যাই তখন সজোরে ফটকের

উপর লাথি, কিল, চড় মারিতে লাগিল, কিন্তু সে লোহার কপাট একটুও কাঁপিল না। তখন সে নিরুপায় হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। পাড়ার লোকে তাহার কোনো খবরই লইল না;—তখন অনেক রাত হইয়াছে, তা ছাড়া পান্থনিবাসের আশেপাশে এমন গোলমাল শোনা তাহাদের অভ্যাস হইয়া গেছে। বিশেষ কিছু ঘটিয়াছে এ কথা কেহই মনে করিল না। অল্পক্ষণ পরেই এক পাহারাওয়ালা আসিয়া সাইয়ের পিঠে রুলের গুঁতা দিয়া বলিল—চুপ র' চেঁচাসানে। এই বলিয়া সে একটা হাতকড়ি বাহির করিল। সাই কোনো কথা না বলিয়াই তৎক্ষণাৎ কি একটা চক্‌চকে জিনিস তাহার পকেটে গুঁজিয়া দিল। আগুনে যেন জল পড়িল! পাহারাওয়ালা একেবারে নরম হইয়া গেল—তাহার কথার ভঙ্গি, গলার স্বর পূর্ব্বের চেয়ে অনেক নীচের পর্দ্দায়

নামিয়া আসিল। সে বলিল—মশায়! আপনার ভারি ভাগ্যি যে আমার নজরে পড়েছিলেন, আর কেউ হ'লে কথাটি না কয়ে একেবারে হাজতে ঠেলতো। আমি ভদ্রলোক, ভদ্রলোকের মান রাখতে জানি! এখন যত সব ছোটোলোক পুলিশে ঢুকেছে—তারা ভদ্রলোকের মান রাখে না! হ্যাঃ, আপনার হয়েছে কি—জিজ্ঞাসা করতে পারি?

সাই গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল—আমার স্ত্রী চুরি গেছে!

স্ত্রী—চুরি! এতদিন পাহারা দিচ্ছি, কই, এমন কথা তো কখনো শুনিনি! গায়ে কি দামী গহনা ছিল?

—ছিল বই কি! তা ছাড়া আমার ছেলে সেই সঙ্গে!

ছেলে! এমন চোর তো দেখিনি কখনো! ছেলে পোষবারই যদি তার সামর্থ্য আছে তবে সে চুরি করে কেন? মশায়! আপনার

কথাগুলো কেমন-কেমন ঠেকছে! কিছু মনে করবেন না। কথা শুনলে আপনার মাথার ঠিক আছে কিনা সন্দেহ হয়। আপনি একটু বিবেচনা করে আমাদের মতো লোকের সঙ্গে কথা কইবেন—কারণ এসব কথা আদালতে আপনারই বিপক্ষে দাঁড়াতে পারে!

সাই রাগে ফুলিতে ফুলিতে হুড় হুড় করিয়া আদ্যোপান্ত সব বলিয়া ফেলিল। তার পর বলিল – বাপু হে! আজ এখনই যদি তোমাদের পুলিশের কর্তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারো তাহ'লে যা চাইবে তাই পাবে!

পাহারাওয়ালা মাথা নাড়িয়া বলিল—অসম্ভব! এতরাত্রে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া অসম্ভব! তিনি এই সবে চণ্ডু খেতে বসেছেন। তাছাড়া, তাঁকে নজর দেবার মতো কোনো জিনিস তোমার কাছে তো এখন নেই—এত রাত্রে দোকান পাট বন্ধ, কিনতেও পাওয়া যাবে না। এখানকার

বিচারকর্ত্তা বড় বদমেজাজি ; মুখে কোনো কথা শোনেন না—লিখে তাঁকে সব জানাতে হয়। তোমার নালিশ কি তা আগে ভালো করে লেখাতে হবে। আমি তোমাকে একজন লোকের কাছে নিয়ে যেতে পারি—সে ভারি পণ্ডিত! এমন করে বানিয়ে তোমার কাহিনী লিখে দেবে যে আদালতে তা পড়বার সময় ঘরসুদ্ধ লোক চমকে উঠবে। সেই তোমায় বলে দেবে কি সংবাদ দিলে বিচারপতি সন্তুষ্ট হবেন—এবং কোন্ সময়টিতে দেখা করলে তোমার কাজ হাঁসিল হ'বে—সব সময় তিনি খুস্ মেজাজে থাকেন না তো।

—দেখুন মশায়! আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বলেই আপনার সব দিকে সুবিধা হয়ে গেল। আর কেউ হলে, এতক্ষণ হাজতে পুরে পিঠে বেত কশাতো।

এই বলিয়া সে সাইয়ের দিকে আর একবার

ডান হাতটা বাড়াইয়া দিল এবং অল্পক্ষণ পরেই সে হাত জামার জেবের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

সাই তখন তাহাকে সঙ্গে করিয়া পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত ব্যক্তিটির বাসায় গেল। সেখানে নিজের দরখাস্ত লেখাইয়া বাহির-বারান্দার একপাশে শুইয়া রহিল। সকাল হইলে দরখাস্তখানি লইয়া তাহার সঙ্গে কিছু ফলমূল ও মিষ্টান্ন যোগ করিয়া বিচারকের পায়ের কাছে ধরিল। বিচারক দরখাস্ত-পত্রখানির দিকে নজর দিয়া তাহা পাঠ করিতে হুকুম দিলেন। পাঠ শেষ হইলে সাইকে তাহার নাম, ধাম, গোত্র, ব্যবসা জিজ্ঞাসা করিয়া একখানা প্রকাণ্ড খাতায় তাহা টুকিয়া লইলেন।

সাই খুব উৎসাহের সহিত বিচারপতির কথায় জবাব দিতে লাগিল। সে বলিল —এ জেলায় সে আর কখনো আসেনি বটে কিন্তু এর পরের জেলায় তাকে সকলেই চেনে,

সেখানে সকলেই তাকে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি বলে জানে।

বিচারক বলিলেন—এ জেলায় আর কখনো আসনি? সে কথা আগে বললে না কেন? প্রথমে তারই বিচার করতে হবে যে! তুমি এ দেশের পরিচিত লোক নও, অথচ এখানকার আদালতে বিচারপ্রার্থী; সে কারণে আইন অনুসারে তোমার জরিমানা হবে। যথা:—তোমার যে নামধাম টুকে নিয়েছি তার জন্য এক ভরি রূপো। তারপর তুমি যে কাল রাত্রে রাস্তায় গোলমাল করেছ তার দরুন এক ভরি রূপো। এ ছাড়া পাহারাওয়ালার মিছা-মিছি সময় নষ্ট করেছ তার জন্য এক ভরি, এই আদালতে প্রবেশের জন্য এক ভরি, তোমার আর্জি শোনা হয়েছে তার জন্য এক ভরি, আমার এতটা সময় গেল তার জন্য দশ ভরি, আদালতের আমলা আর্জি পড়েছে তার দু ভরি এবং আমি যে তোমার এই সুবিচার করলুম তার

পাঁচ ভরি রূপো আদালতের নিয়মে তোমাকে দিতে হবে,—এখনই দিতে পারবে কিনা আগে বল, তবে তোমার অন্য কথা শোনা হবে!

সাই কোনো কথা না কহিয়া কোমরের গেঁজে হইতে রূপা ও তৌল বাহির করিয়া আদালতের পাওনা চুকাইয়া দিল।

বিচারপতি তখন বলিলেন—বেশ! এতক্ষণে সব দস্তুরমাফিক হল—বে-আইনি এখানে চলে না। এখন তুমি যাও; আজ তোমার বিচার কর্তে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছি আজ আর হবে না—কাল বিচার হবে। তার জন্য তোমাকে আরো পাঁচ ভরি রূপো দিতে হবে—ইচ্ছা করলে সেটা এখনই জমা দিতে পারো—কারণ ঐ রূপো আদায়ের জন্য কাল যে আমার সময় নষ্ট হবে তার মূল্য লওয়া আদালতের নিয়ম! আমি আজই তোমার স্ত্রী ও চোরকে তলব করে তাদের শুনানি শেষ করে রাখব। কাল বিচার-ফল জানাব। এখন তুমি নিজের কাজে যাও।

সাই এই কথায় ভয়ানক চটিয়া উঠিল। সে বলিল—আমার আবার কাজ কি? আমার কাজ এই ব্যাপারের একটা নিষ্পত্তি করা। আমার স্ত্রী পুত্র আমি আজ এখনই চাই! তাদের এখনই ধরে আনা হোক! নইলে আমি মহা কাণ্ড বাধাবো!

আদালতের মধ্যে বিচারকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সাইয়ের এই বাচালতায় বিচারকর্ত্তা আগুন হইয়া উঠিলেন, হুকুম না লইয়া কথা কওয়ার অপরাধে সাইয়ের তৎক্ষণাৎ এক ভরি রৌপ্যদণ্ড হইল। আদালতের লোকেরা ছুটিয়া আসিয়া সাইকে কোনো কথা না বলিয়া একেবারে তাহার থলি কাড়িয়া লইল এবং রূপা ওজন করিতে বসিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নিক্তির রূপা রাখিবার বাটিটা নামিয়া আসিয়া মাটিতে ঠেকিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা রূপা চাপাইতে লাগিল। এইরূপ ওজনে সমস্ত রূপাটুকু নিঃশেষ করিয়া লইয়া তাহারা সাইকে

আদালতের বাহির করিয়া দিল। সাই বাহিরে দাঁড়াইয়া খুব চীৎকার করিতে লাগিল। আদালতের লোকেরা তখন তাহাকে ধরিয়া গারদে পুরিল এবং কয়েক ঘণ্টা আটক রাখার পর ছাড়িয়া দিল।

এই ব্যাপারের একটু পরেই লি ঙা-টিকে সঙ্গে লইয়া আদালতে উপস্থিত। কোনো কথাবার্ত্তা না কহিয়া একখানা খুব ভারি রকমের সোনার পাত (অবশ্য সেটি সাইয়েরই সম্পত্তি) একেবারে বিচারকের পায়ের তলায় ধরিল। তারপর বলিল—হুজুর! আমি এ জেলায় প্রায়ই আসি, হুজুরকে আমি খুব জানি—হুজুরের প্রতাপ এ অধমের অবিদিত নাই—আপনিই এখানকার মাবাপ! আমার বড় দুঃখ যে সাই নামে একটা জুয়াচোরের সঙ্গে মামলায় পড়ে হুজুরের কাছে আমায় পরিচিত হতে হ'ল—একটা ভাল উপলক্ষ্য ধরে আসতে পারলুম না। আপনার মতো মহাশয়

ব্যক্তির অমূল্য সময় এই সব মিথ্যা মামলায় নষ্ট হচ্ছে, এ বড়ই আপসোষের কথা !

বিচারক তখন লা-টিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন। লিব সমস্ত-রাত-ধরিয়া-শেখানো বুলি লা-টি মুখস্থ বলার মতো বলিয়া গেল। প্রশ্নোত্তর শেষ হইলে লি সেলাম বাজাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আমার বড় সৌভাগ্য যে আপনার মতো বিবেচক বুদ্ধিমান সুবিচারকের হাতে এই মকদ্দমার ভার পড়েছে। আপনার নিকট যে উপযুক্ত বিচার পাব সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। হুজুরের জ্ঞাতার্থে বলে রাখি যে, এই মকদ্দমার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য আমি এক তাল রূপা হুজুরে জমা

লা-টি ও লি যেমন আদালত হইতে বাহির হইয়া গেল অমনি সাই আসিয়া সেখানে উপস্থিত! সে বলিল—এখনি বিচার করুন!

জবাব হইল—বিচার শেষ হইয়া গেছে। তাহারা স্বামী স্ত্রীতে এতক্ষণ বাড়ি পৌঁছিয়াছে। তুই—

—সে যে আমার স্ত্রী! আমার ছেলে!

—ছেলে? ছেলের কথা তো ওঠে নাই! পরের ছেলে তুই পাবি কেন?

—সে আমার ছেলে—সে আমার ছেলে—সে ছেলে আমার চাই!

—চাই! এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার মুখের উপর কথা!

কথা শেষ হইতে না হইতেই পেয়াদারা আসিয়া সাইকে ধরিল। বিচারকর্ত্তা হুকুম দিলেন—পঁচিশ বেত!

সাইয়ের কানে সেই কথা প্রবেশ করিবা-মাত্র সেখান হইতে সে ছুট্ দিল। যাহারা তাহাকে ধরিতে গেল সজোরে তাহাদের হাত ছিনাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিল। ছুটিয়া একেবারে 'সবওয়া'র প্রাসাদ-তোরণে

আসিয়া দাঁড়াইল। সেখানে একটা প্রকাণ্ড ঢাক বাঁধা ছিল ; সেই ঢাকের উপর ঘন ঘন কাটি দিতে লাগিল।

সবওয়ার প্রাসাদে যে ঢাক আছে তাহা সচরাচর বাজানো হয় না। রাজ্যে যদি বিপদ উপস্থিত হয় তবেই তাহার উপরে কাটি পড়ে। বড় জোর আগুন লাগিলে বা খুন হইলে কখনো কখনো বাজে—তার চেয়ে কম আবশ্যকে কখনো বাজে না। বহুদিন হইতে ঢাক নীরব! আজ হঠাৎ ঢাকের বাদ্য শুনিয়া প্রাসাদের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সবওয়া ব্যস্তসমস্তভাবে বিশ্রাম কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। চাকর নফর, লোক লস্কর, সৈন্য-সামন্ত, দূত, প্রহরী, নাপিত, গায়ক, বাদক, তাম্বুলি, হুঁকাবরদার যে যেখানে ছিল ছুটিয়া বাহিরে আসিল, এবং সমুখে যে যে-অস্ত্র পাইল উঠাইয়া লইল। কাহারো হাতে শুধু ঢাল, কাহারো হাতে শুধু তলোয়ার! কেউ

ধনুক লইয়াছে তীর লয় নাই, কেউ তূণ লইয়াছে ধনুক লয় নাই।

সাই তখনো ঢাক বাজাইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে আশপাশের জনতার দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিতেছে। ভয়ে কেহ তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে না। অসমসাহসী একজন ছিল সে একটু কাছে গিয়া সাইকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি চাও তুমি?" তখন আর সকলে সাহস পাইয়া তাহার দিকে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল এবং সমস্বরে বলিয়া উঠিল—কি চাও তুমি?—কি চাও তুমি?

সাই বলিল—বিচার চাই!

সবওয়া যখন দেখিলেন কোনো বিপ্লব বাধে নাই বা কোনো শত্রুপক্ষ তাঁহার প্রাসাদ আক্রমণ করে নাই তখন তিনি উপরের বারান্দা হইতে মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্যাপার কি? কে ও?

যে সর্বপ্রথম সাইকে প্রশ্ন করিয়াছিল সে

সবওয়ার দিকে মুখ তুলিয়া বলিল—হুজুর! একজন চীনে—বিচার চায়!

সবওয়া বলিলেন—ওঃ! বিচার চায়! বেশ! লোকটা পাগল কিম্বা মাতাল নয় তো? হাতে অস্ত্রশস্ত্র আছে না কি?

—আজ্ঞা না হুজুর!

—তবে ওপরে নিয়ে আয়।

জন পঞ্চাশেক লোক সাইকে পাকড়াও করিয়া টানিতে টানিতে সিঁড়ি দিয়া উপরে তুলিল, এবং সবওয়া যে মঞ্চের উপর বসিয়াছিলেন তাহার তলায় ধপ্ করিয়া ফেলিয়া দিল।

সবওয়া সাইকে প্রশ্ন করিলেন—ঢাক পিটছিলে কেন?

সাই হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—আমার স্ত্রী—আমার পুত্র—চুরি গেছে—আদালতে বিচারের জন্য গিয়েছিলাম—বিচার হয়েছে আমারই পিঠে পঁচিশ বেত!

সবওয়া গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন

—হুঁঃ! তারপর একটু চুপ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—তোমার বোধ হয় জানা নেই আমার ঢাক যখন-তখন বাজে না। যদি কেউ শুধু শুধু বাজায় তাকে শাস্তি পেতে হয়। আগে সেই শাস্তি নাও তবে তোমার অন্য কথা শুন্‌বো। ওরে! একে পঁচিশ বেত দে!

দুইজন পাইক আসিয়া সাইকে বাঁধিয়া লইয়া গেল। বেতমারা হইয়া গেলে সবওয়া বলিলেন—এতক্ষণে আইনমাফিক্ সব হল! এরাজ্যে বে-আইনি হবার যো-টি নেই! এখন বল তোমার কি বলবার আছে—কে তোমার স্ত্রীপুত্র চুরি করেছে?

সাইয়ের অঙ্গ বেত্রাঘাতে যত না জ্বলিতেছিল রাগে তত জ্বলিতেছিল। সে একটু সামলাইয়া গেল: এতক্ষণে তাহার এই সৎবুদ্ধিটুকু জন্মিয়াছে যে রাগ প্রকাশ করিলে আসল কাজ মাটি হইবে—উপরন্তু লাঞ্ছনার অন্ত থাকিবে না। সে ধীরভাবে

আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিল। কথা শুনিয়া সবওয়া হুকুম দিলেন—যা এখনি তাদের সকলকে ধরে নিয়ে আয়।

সব কথা বাহির হইতে না হইতে পঁচিশজন লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল এবং পাহনিবাসে যে যেখানে ছিল সকলকে ধরিয়া আনিল—কি জানি বাছিয়া আনিতে গেলে যদি আসল লোককে না আনা হয়!

সবওয়া লিকে জিজ্ঞাসা করিলে লি বলিল লা-টি তাহার পত্নী।

সাই বাধা দিয়া বলিল—মিথ্যা কথা! লা-টি আমার স্ত্রী!

তার পর লা-টিকে প্রশ্ন করা হইল। সে বলিল—সাইকে আমি চিনি না—লিই আমার স্বামী!

এ বড় সমস্যার কথা! এখন লা-টি সত্যই কাহার স্ত্রী এ কথা বিচার করিয়া বলা বড় সহজ নহে। সবওয়া বিপদে পড়িলেন। বৃদ্ধের

কুঞ্চিত ভ্রু আরো কুঞ্চিত হইয়া উঠিল! কি বিচার হয় শুনিবার জন্য সভাসুদ্ধ লোক স্তব্ধ হইয়া রহিল!

সবওয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন —ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখভাবের পরিবর্ত্তন হইল। তখন তিনি আবার স্থান-গ্রহণ করিলেন। বলিলেন—"বুড়ো মানুষ দৌড়ধাপ করে ক্ষিধে পেয়েছে—ওরে যা তো কিছু খাবার নিয়ে আয় তো!

তৎক্ষণাৎ সোনার থালে ফলমূল-মিষ্টান্ন আসিয়া হাজির হইল। সাইয়ের ছোট ছেলেটি সেখানে বসিয়াছিল তাহার হাতে আগে না দিয়া কি কিছু মুখে তোলা যায়! সবওয়া তাহাকে ডাকিয়া একটা মিষ্টান্ন দিলেন। সে তাহা লইয়া খাইতে লাগিল। সবওয়া তখন নিজে আহারে মন দিলেন এবং মধ্যে মধ্যে ছেলেটির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

ছেলেটির যখন খাওয়া শেষ হইল তখন সবওয়া তাহাকে আবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —আর কিছু খাবি ?

সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না !

সবওয়া বলিলেন—যা, তবে চট্ করে তোর বাপকে এইটে দিয়ে আয় !

সে যাহাকে বরাবর নিজের বাপ বলিয়া জানে দৌড়িয়া গিয়া তাহারই হাতে মিষ্টান্ন তুলিয়া দিল। সাই তাহাকে সস্নেহে কোলে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিল। সভামধ্যে সবওয়ার স্বয় জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল !

সবওয়া তখন দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন —আমার বিচারে বদমায়েস লি দোষী—তাহাকে রাস্তার মাঝে দাঁড় করাইয়া পাঁচশো কোড়া মারা হোক্ ! লা-টিও দোষী—তার দুশোবার কান মলা হোক্। আর ছেলেটি বিচার কার্যে সহায়তা করিয়াছে বলিয়া পুরস্কার-স্বরূপ তাহাকে আমার পাতের বাকি মিষ্টান্ন দেওয়া হোক্ !

ঘটনাচক্র

স্বামী ও স্ত্রীতে প্রায়ই তর্ক বাধিত। তর্কের বিষয় খুব জটিল না হইলেও কথার উপর কথা পড়িয়া তাহা কেবল জট পাকাইত—মীমাংসা কখনো হইত না। স্বামী যাহা স্থির করেন তাহা আদপেই স্ত্রীর মনের মতো হয় না এবং স্ত্রীর যাহা মন্তব্য তাহা এমনই বুদ্ধি-হীনতার পরিচায়ক যে স্বামীর মতো বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা কখনই গ্রাহ্য করিতে পারেন না। এই রূপে দুইটি প্রাণী চিরকাল পাশাপাশি থাকিয়া নিজ নিজ মত স্থাপন করিয়াই চলিতেছিল; কিন্তু দুইটি সমান্তরাল সরলরেখার মতো তাহাদের মতের মিল হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছিল না।

রামলোচন বাবু সেকালের লোক হইলেও অনেক বিষয়ে একালের লোকের মতো ছিলেন।

বাল্যবিবাহ প্রভৃতি কতকগুলি সামাজিক বিষয়ে তিনি ঠিক সেকেলে মত পরিপোষণ করিতেন না। নয় বছরের কন্যার বিবাহ দিয়া গৌরীদানের ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার বড় দেখা যাইত না, কিম্বা অল্পবয়স্ক পুত্রকে সংসারী করিয়া পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ পাইবার ব্যবস্থা সম্বন্ধেও তাঁহার বিশেষ ব্যগ্রতা ছিল না। তিনি মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইয়া একটু বড় করিয়া বিবাহ দিবার পক্ষপাতী ছিলেন এবং ছেলেদের বেলায় বলিতেন যে রীতিমত অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারা পর্য্যন্ত তাহাদের বিবাহ করা উচিত নয়।

অন্যান্য মতের চেয়ে তাঁহার এই শেষোক্ত মতটির একটু বিশেষ দৃঢ়তা ছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র নরেন্দ্রনাথ বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, বয়স একুশ পার হইতে চলিল, গৃহিণীর সোহাগমিশ্রিত অনুরোধ, অভিমানসঞ্জাত ক্রোধ, ঘটক-ঘটকীর প্রাত্যহিক উত্যক্ততা,

এ সমস্ত কিছুই রামলোচনকে সংকল্পভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। পুত্রের বিবাহের কথা উঠিলেই তিনি সে কথা চাপা দিয়া বলিতেন —"নরেন টাকা-কড়ি আনুক, উপায় করুক, তবে তো বিবাহ করবে। এত তাড়াতাড়ি কেন? এখন থেকে একটা গলগ্রহ জুটিয়ে দিয়ে আমি তার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ মাটি করতে পারব না,—বাপ হয়ে তাকে দুঃখের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে ফেলে দেবো?"

গৃহিণী কিন্তু একথা কিছুতেই বুঝিতেন না। একটি পুত্রবধূ ঘরে আনিবার জন্য তাঁহার অধীরতা দিন দিন বাড়িয়াই উঠিতেছিল। তিনি প্রতিদিন নানা উপায়ে স্বামীকে উত্যক্ত করিতেন, কিন্তু রামলোচন কিছুতেই রাজি হইতেন না। তিনি বলিতেন—"অর্থোপায় না করে বিবাহ করাতে আমাদের দেশের দৈন্য দিন দিন বেড়ে উঠছে; ছেলের বিয়ে দেবার সময়ে প্রত্যেক পিতা মাতার একথা ভাবা উচিত।"

স্ত্রী পাল্টা জবাব দিয়া বলিতেন—'আজ পর্য্যন্ত কেউ এ বিষয়ে ভাবলে না, আর তোমারই ছেলের বিয়ের সময় ভাবনার আকাশ ভেঙে পড়ল—যত সব অনাসৃষ্টি কথা ! কই তুমি নিজে বিয়ে করবার সময় তো একথা ভাবনি ! তখন তো তুমি উপায়ের 'উ' পর্য্যন্ত জানতে না—তার জন্যে তোমায় এমন কি দুঃখের সাগরে ভাসতে হয়েছে।"

রামলোচনবাবু এ কথায় একটু থতমত খাইয়া যাইতেন, স্ত্রীর দৃষ্টান্তকে অমান্য করিবার যো নাই, লক্ষ্মীর কৃপায় তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না। কিন্তু তিনি এত সহজে পরাজয় মানিবারও পাত্র নহেন, তিনি বলিতেন —"সে কাল কি আছে !"

স্ত্রী উত্তর করিতেন—"কাল আবার গেল কোথায়—তখনও যেমন চন্দ্রসূর্য্য উঠত এখনও তেমনি ওঠে, তখনকার মতো এখনও দিন রাত্রি

আছে; ছেলের বিয়ে দেবার বেলায় তুমিই কাল ঘুরিয়ে দিচ্ছ বইত নয়।"

স্বামী একটু বিরক্ত হইয়া বলিতেন—"চন্দ্র সূর্য্যের পানে চেয়ে তো আর মানুষের পেট ভরে না। সেকালে চার টাকায় একটা লোকের চলত, এখন চল্লিশ টাকাতেও কুলায় না। তখন লোকে যা উপার্জ্জন করতে পারত এখন তার সিকিও পারে না।"

স্ত্রী বলিতেন—তার জন্য স্ত্রীপুত্র দায়ী নয়। আমাদের শাস্ত্রে বলে স্ত্রী স্বয়ং লক্ষ্মী: স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে লক্ষ্মী আসেন—স্ত্রী-অভাবে পুরুষরা লক্ষ্মী-ছাড়া!"

রামলোচন বাবু রাগিয়া উঠিয়া বলিতেন —"তোমার মতো মূর্খকে তর্কে বুঝানো যায় না। সংসারের বোঝা ঘাড়ে করে দিন দিন যে লোকে দৈন্যের সাগরে ডুবছে একথা তোমার মতো মূর্খ স্ত্রীলোকে বুঝতে পারবে না। যাও—

আমি তর্ক করতে চাইনে—আমার এক কথা, নরেনের বিয়ে দেবো না।"

স্বামীর এই রূঢ় বাক্যে স্ত্রীর চোখে জল আসিত, তিনি আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া যাইতেন। কিন্তু পরদিন আবার পুত্রের বিবাহ-প্রসঙ্গ উথাপন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার প্রাণটা ছটফট করিত। শেষে যখন তর্কে পারিয়া উঠিতেন না তখন বলিতেন—"আচ্ছা, অদৃষ্টে যদি ওর বিয়ে এখন থাকে তো কেউ ঠেকাতে পারবে না!"

স্বামী চটিয়া উঠিয়া বলিতেন—"সেই বেশ! অদৃষ্টের দিকেই তাকিয়ে থাকো—আমায় কেন বিরক্ত কর!"

(২)

রামলোচন সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন, নরেন অর্থোপার্জ্জন না করিলেও পিতৃ-অর্থে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত। তত্রাচ তিনি পুত্রের বিবাহ দিতে

চাহিতেন না তাহার কারণ, তিনি নিজে যে সত্যকে ভালো বলিয়া সকলের কাছে প্রচার করিতেন তাহা অমান্য করাকে তিনি হৃদয়ের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা মনে করিতেন। তাঁহার মনে মনে গর্ব্ব ছিল, তিনি একজন দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি, তিনি সে গর্ব্বের হানি করিতে চাহিতেন না। কথায় বার্ত্তায়, আলাপে ব্যবহারে তিনি প্রকাশ করিতেন যে, সমাজের মধ্যে যে কুপ্রথা আশ্রয়লাভ করিয়া জাতিকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে, অন্ধ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে তিনি কিছুতেই প্রশ্রয় দিবেন না। সমাজের যে অংশ জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, প্রাণপণ শক্তিতে তিনি তাহার সংস্কার করিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার এই বাক্যের সহিত তিনি নিজের দৈনন্দিন কর্ম্মের সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতেন। পুত্রকে উপারক্ষম করিবার জন্য তিনি যে এত ব্যস্ত ছিলেন তাহার আরো এক কারণ,—তিনি মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলেন,

নিজের অর্জিত অর্থ দেশের কোনো হিতকল্পে দান করিয়া যাইবেন।

হিন্দুর অন্তঃপুর, কঠিন ছাঁচে গঠিত। রামলোচন বাবু বহিঃসমাজ সংস্কারের অভিমত যত সহজে ব্যক্ত করিতে পারিতেন নিজের পরিবারে সেই অভিমত কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া দেখিতেন যে সংস্কার ব্যাপারটা তেমন সহজ নয়। তাঁহার যুক্তি, তাঁহার শাসন অন্তঃপুরের কঠিন প্রাচীরে লাগিয়া নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিত। তাঁহার পত্নীর বুদ্ধির প্রাখর্য্য যথেষ্ট ছিল বটে, কিন্তু সে প্রাখর্য্য অন্তঃপুরের মধ্যে অজ্ঞানতিমিরাবৃত গুপ্ত অনিষ্টের উপর আলোকবর্ষণ করিতে পারিত না; সেগুলি তাঁহার স্বামী চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও তিনি দেখিতে পাইতেন না, দেখিতে পাইলেও তাহা অনিষ্টকর বলিয়া স্বীকার করিতেন না। এই রকমে একটি ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে অনবরত পরিবর্ত্তন ও পরিরক্ষণের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল।

পত্নী স্বামীর সকল উৎপাত মার্জ্জনা করিতেন কিন্তু পুত্রের বিবাহের আপত্তিতে তিনি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা ছিল না, একটিমাত্র পুত্র। পুত্রের সহিত একটি ছোট বালিকার বিবাহ দিয়া তাহাকে কন্যার মতো প্রতিপালন করিবেন, এ আশা তাঁহার বহু দিনের সঞ্চিত। তিনি অনেক দিন হইতে বাড়ীর মধ্যে একটি অবগুণ্ঠনহীন ক্ষুদ্রবধূর ছুটা-ছুটি, খেলা-ধূলা, আদর-আব্দার কল্পনা করিয়া আসিতেছেন। ভাবী বধূর জন্য কত রাশি রাশি খেলনা, কত রকমের পোষাক পরিচ্ছদ সঞ্চিত হইয়া আছে, তাঁহার যখন যে জিনিসটি চোখে ভাল ঠেকিয়াছে তাহা সেই অনাগত বধূটির জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। নানা উপাদানে ও আড়ম্বরে একটি খেলাঘর প্রস্তুত, কিন্তু খেলিবার প্রাণীটির অভাবে তাহা ধূলিসাৎ হইতে বসিয়াছে! এত করিয়া যে আশা পুষ্ট করিয়া আসিয়াছেন,

কেবল স্বামীর একটা অকারণ জেদের জন্য তাহা ফলবতী হইতে পারিতেছে না—এই কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার চক্ষে জল আসিত।

এক একদিন ছাদে উঠিয়া যখন দেখিতে পাইতেন ব্যাণ্ডের বাদ্য ও আলোকমালায় বেষ্টিত হইয়া অপর বাড়ির ছেলে বিবাহ করিতে যাইতেছে তখন তাঁহার প্রাণটা ভরিয়া উঠিত; মনে হইত, কবে তাঁহার পুত্রটিও এমনি করিয়া একটি সোনার চাঁদ বধূ আনিতে যাইবে। তিনি অনেক দিন অপেক্ষা করিয়া আছেন, আর পারেন না:—নরেন এম, এ পাশ করিবে, ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, অর্থোপার্জ্জন করিবে, ওঃ সে অনেক দিনের কথা!

(৩)

ঘটকীর মুখে একটি বালিকার বিবরণ শুনিয়া তাহাকে পুত্রবধূরূপে বরণ করিবার জন্য রামলোচন-গৃহিণীর বড় ইচ্ছা হইতেছিল। তাঁহার এ ইচ্ছার প্রধান কারণ বালিকাটি পিতৃমাতৃহীনা। তাঁহার মনে হইতেছিল, তাহাকে পাইলে, আদর যত্ন ও স্নেহে তিনি তাহার মাতার স্থান শীঘ্রই অধিকার করিতে পারিবেন। মেয়েটির প্রতি গৃহিণীর মাতৃস্নেহ আপনা-আপনি উৎসারিত হইয়া উঠিতেছিল। বালিকার নাম শুভা। সে তাহার এক দরিদ্র মাতুলের গৃহে প্রতিপালিত হইতেছে। মাতুলের এমন সংস্থান নাই যে, নিজের পুত্র-কন্যাগুলিকে রীতিমত গ্রাসাচ্ছাদন দিতে পারেন, কাজেই শুভা সেই সংসারে দুর্ব্বিসহ ভারস্বরূপ বিবেচিত হইতেছিল। আশ্রয়হীনা, স্নেহবঞ্চিতা, বুভুক্ষু বালিকা যেখানে আশ্রয়

স্নেহ ও অন্নের জন্য আসিয়াছিল সেখানে তাহা দুষ্প্রাপ্য। গৃহিণীর ইচ্ছা হইতেছিল, তাহাকে এই দারিদ্র্যের মরুভূমি হইতে উঠাইয়া ঐশ্বর্য্যের শ্যামলস্নিগ্ধ ক্রোড়ে স্থাপন করেন। কিন্তু শীঘ্র সে অভিলাষ পূর্ণ করিবার কোন উপায় দেখিতেছিলেন না বলিয়া অন্তরে দারুণ দুঃখ বোধ করিতেছিলেন।

গৃহিণী শুভাকে যখন নিজের চোখে দেখিয়া আসিলেন, তখন তাহাকে বধূরূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা অধিকতর বলবতী হইয়া উঠিল। মেয়েটির উপর কেমন একটা মায়া পড়িয়া গেল—কেবলই মনে হইতে লাগিল তাহার সহিত তাঁহার নিজের যেন কি একটা সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তর হইতে স্থির হইয়া আছে। তিনি স্বামীকে হৃদয়বান ব্যক্তি বলিয়া জানিতেন, সেই জন্য মনে করিলেন দুঃস্থ পরিবারের করুণ আবেদন হয়ত স্বামীর ধনুর্ভঙ্গ পণ টলাইতে পারে,—শুভার মাতুলানীকে বলিয়া আসিলেন,

যেন তাঁহারা কর্ত্তার কাছে গিয়া নিজেদের দুঃখকাহিনী জানাইয়া বিবাহের জন্য বিশেষ করিয়া ধরিয়া পড়েন।

কিন্তু তাহাতেও কোনো ফল হইল না। সুতরাং নকুল একদিন কাঁদিয়া রামলোচনের পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"আমি গরীব, আমায় রক্ষা করুন, শুভাকে আপনার গৃহে স্থান দিন, নইলে আমি মারা যাই।"

মাতুলের কাতরতায় রামলোচন দুঃখ অনুভব করিলেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য নিজের সংকল্পে জলাঞ্জলি দিতে মন সরিল না। তিনি নিজে দারিদ্রের সন্তান ছিলেন, দরিদ্রপরিবারের কন্যাকে পাত্রস্থ করা কি কষ্টকর তাহা তিনি জানিতেন, কারণ বাল্যাবস্থায় তাঁহার ভগিনীর বিবাহ দিবার সময় পিতার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার নিদ্রা-বিহীন রজনীযাপন, চিন্তাভারাক্রান্ত বিশুষ্কমুখ, অর্থসংগ্রহের বিফল চেষ্টায় রাত্রিদিন

ব্যতিব্যস্ততা দেখিয়া তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি যদি পারেন তো ভবিষ্যৎ জীবনে এ কষ্টের প্রতিকারের যথাসাধ্য চেষ্টা পাইবেন;—নিজের পুত্রের বিবাহ দরিদ্র কন্যার সহিত দিবেন, এক কপর্দ্দকও আকাঙ্ক্ষা করিবেন না।

কিন্তু এখন কার্য্যক্ষেত্রে বাল্যকালের সেই প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে পরিণত বয়সের সমাজ-হিতসংকল্প দণ্ডায়মান। চিন্তা করিয়া দেখিলেন, সে প্রতিজ্ঞার মূল্য অপেক্ষা এখনকার সংকল্পের মূল্য অনেক অধিক;—তাহা এত সহজে তিনি ত্যাগ করিতে পারেন না। শুভার মাতুলকে একেবারে মনঃক্ষুণ্ণ করিতে চাহিলেন না, বিবাহের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করিবেন বলিয়া বিদায় করিলেন; যাইবার সময়ে তাঁহাকে বলিয়া দিলেন,—"কিন্তু আমি একটা সর্ত্ত রাখতে চাই,—কোনো উপার্জ্জনক্ষম পাত্রকে কন্যাদান করতে হবে,

কেবল কুলগৌরবের প্রতি লক্ষ্য রাখলে চলবে না। এতে যদি বেশী অর্থের প্রয়োজন হয়, তা দিতেও প্রস্তুত আছি।"

রামলোচন-পত্নীর আশা পূর্ণ হইল না। এত করিয়াও তিনি তাঁহার স্বামীকে সেই কঠোর পণ হইতে এক পাও সরাইতে পারিলেন না।

(৪)

একমাত্র পুত্র বলিয়া নরেন্দ্রনাথ মাতার পূর্ণস্নেহটুকু ভোগ করিতেছিল। মাতা তাহাকে এখনও পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র শিশুটির মতো পালন করিয়া আসিতেছিলেন। পুত্রের সকল পরিচর্য্যা তিনি নিজের হাতে করিতেন। আহার শয়ন, প্রভৃতির তত্ত্বাবধান নিজে না করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না। এই কারণে নরেন গৃহকর্ম্মে বালকের মতো অপটু রহিয়া গিয়াছিল, বিদ্যাচর্চ্চায় জ্ঞান বাড়িতেছিল কিন্তু

পরনির্ভরতায় নিতান্ত নিঃসহায়ের অবস্থা হইতে এক পাও অগ্রসর হইতে পারে নাই। পরিবার কাপড় জামা মা না ঠিক করিয়া রাখিলে তাহার জনসমাজে বাহির হওয়া দুর্ঘট হইত! পড়ার বই ও লেখার কালিকলম হাতের কাছে মা যদি গুছাইয়া না দিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় তাহাকে সবগুলি পরীক্ষায় ফেল হইয়া আসিতে হইত।

নরেনের পাঠগৃহ তাহার মা প্রতিদিন পরিষ্কার করিয়া গুছাইয়া দিতেন। কালেজের নোট্-বইয়ের ভ্রষ্টপাতা, তর্জ্জমা ও এক্সারসাইজের খাতা, পাঠ্যপুস্তক, সংবাদপত্র এবং নানারকমের ইংরাজী-বাংলা-লেখা ছেঁড়া কাগজ ঘরময় ছড়ানো থাকিত। আলগা কাগজ বাতাসে উড়িয়া বেড়াইত, মা সেগুলি প্রতিদিন উঠাইয়া ঠিক করিয়া গুছাইয়া রাখিয়া দিতেন। কাজের সময় নরেন এই সব কাগজপত্র যখন খুঁজিয়া পাইত না, তখন জননীর

নিকট অনুসন্ধান করিত, তিনি বাহির করিয়া দিতেন।

একদিন জঞ্জাল সরাইতে সরাইতে হঠাৎ নরেনের হাতের লেখা এক টুকরা কাগজ তাহার মাতার চোখে পড়িল। সেই কাগজের শিরোদেশে লিখিত দুইটা কথা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল,—"প্রিয়তমা মঞ্জরি!" তিনি তাড়াতাড়ি উঠাইয়া লইয়া পড়িয়া দেখিলেন লেখা আছে :—"প্রিয়তমা মঞ্জরি! যে কথা বহুদিন হৃদয়ের মধ্যে গোপন রাখিয়াছি, প্রতিদিন আশার বারিসিঞ্চনে যাহাকে পল্লবিত করিয়া তুলিয়াছি; যে কথা মুখে প্রকাশ না করিলেও নয়নের দৃষ্টিতে এবং মুখের ভাবে আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহা গোপন করিতে যাইয়া কেবল প্রকাশই করিয়া ফেলিয়াছি, সেই কথা আজ তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিব—আমি তোমায় ভালবাসি! আমার জীবনমরণের দেবী তুমি! হৃদয়ের

মাঝে প্রেমের মন্দিরে তোমার প্রতিষ্ঠা করিয়াছি!”

পত্রখানি গৃহিণীকে স্তম্ভিত করিয়া দিল। তিনি বারবার করিয়া তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন—যতই পড়েন ততই শিহরিয়া উঠেন, ততই দেখিতে পান সম্মুখে এ কি বিপদ! তাঁহার পুত্র এ কি কুৎসিৎ প্রেমাভিনয় করিতেছে! ছি—ছি! লজ্জায় তিনি মরমে মরিয়া যাইতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন —এও কি সম্ভব? কিন্তু অবিশ্বাস করিবার মতো কিছু প্রমাণ যে পান্ না! তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন কে এ মঞ্জরী? সে কি তাঁহাদেরই নিকটতম প্রতিবাসীর কন্যা না কি? নরেনের পাড়বার ঘরের জানালার সামনে তাহারও যে পড়িবার ঘর! তাহার সহিত প্রণয় হওয়াতো অসম্ভব নয়!

(৫)

রামলোচন বাবুর বাড়ীর ঠিক পাশেই বিনোদবিহারী বাবুর বাসা। তাঁহার এক অবিবাহিত যুবতী কন্যার নাম মঞ্জরী। এই মঞ্জরীর উদ্দেশ্যেই যে নরেনের প্রেম-পত্র লিখিত সে বিষয়ে গৃহিণীর বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না।

ছেলেদের অল্প বয়সে বিবাহ না দিলে তাহারা স্বভাব-চরিত্র ঠিক রাখিতে পারে না, এইরূপ একটা সংস্কার গৃহিণীর বরাবর ছিল। তিনি বলিতেন ক্ষুধার উদ্রেকে যেমন আহারের একটা প্রয়োজনীয়তা আছে যৌবনের বিকাশে তেমনি বিবাহেরও আবশ্যক আছে; এত বড় একটা সত্যকে অমান্য করিলে কখনোই শুভ হইতে পারে না। সেই কারণে পুত্রের এই প্রণয়-ব্যাপারে তিনি নরেনের দোষ যত না দেখিলেন স্বামীর দোষ ততোধিক

দেখিলেন। তিনি বলিলেন—যত অপরাধ সবই তো স্বামীর!—তিনিই তো যত নষ্টের মূল, যথাসময়ে বিবাহ দিলে তো আর এ কাণ্ডটা ঘটিত না। পুত্রের বিবাহের পক্ষে তিনি যত যুক্তি দেখাইয়াছেন স্বামী এতদিন সে সমস্ত কেবল অগ্রাহ্যই করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এইবারকার এই ঘটনায় তিনি যে নিশ্চয় জয়লাভ করিবেন এই কথা মনে করিয়া তাঁহার ভারি আনন্দ হইতে লাগিল।

গৃহিণী ভাবিয়া দেখিলেন, এ প্রণয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল বিবাহ। কিন্তু মঞ্জরী যে ব্রাহ্ম-কন্যা! তাহাকে বিবাহ করিলে পুত্রের জাতি যাইবে। জাতিপাত তাঁহার কাছে বড় সামান্য জিনিষ নহে, সেটাকে তিনি অত্যন্ত ভয় ও অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। তিনি জীবিত থাকিতে কিছুতেই এ বিবাহ ঘটিতে দিতে পারিবেন না। পুত্র অসামাজিক বিবাহ করিলে তাহাকে আর আপনার সংসারে

রাখা চলিবে না, নিতান্ত পরের মতো বাহিরে রাখিতে হইবে!—হৃদয়ের সহিত শত গ্রন্থিতে যে বাঁধা কেমন করিয়া তাহাকে টানিয়া ফেলিয়া দিবেন!

(৬)

গৃহিণী যখন পুত্রের হাতের লেখা সেই চিঠি স্বামীর নিকট উপস্থিত করিলেন তখন তিনি চমকিয়া উঠিলেন—তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। এরূপ ঘটনা যে ঘটিতে পারে তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। অনুপযুক্ত অবস্থায় বিবাহ করা যে অমঙ্গলজনক তাহাতে তাঁহার দুই মত ছিল না; কিন্তু জিনিসটার সব দিক তিনি ভালো করিয়া দেখেন নাই,—এখন বুঝিতে পারিলেন, ইহার এমন একটা দিক আছে—যাহা রক্ষা করিয়া না চলিলে অধিকতর অমঙ্গল হইতে পারে। এখন যে

তাঁহার ত্রুটি সংশোধন করিয়া লওয়া দরকার হইয়াছে সে কথা অস্বীকার করিলেন না। রামলোচনের হৃদয় যতই উদার থাকুক পুত্রকে অহিন্দু পরিবারে বিবাহ করিতে দিবেন, এত উদারতা তাঁহার ছিল না।

গৃহিণী বলিলে—"এখন কি করবে?"

রামলোচন উত্তর দিলেন—"নরেনের বিবাহ না দিয়ে ভালো করি নি, এখন সে কাজটা শীঘ্র সেরে নিতে হবে।"

রামলোচন-পত্নী মনে করিয়া আসিয়াছিলেন যে স্বামীর উপর আজ অনেক দিনের শোধ তুলিবেন! কিন্তু তিনি যখন নিজের দোষ স্বীকার করিয়া লইলেন তখন আর রূঢ়তা করা চলিল না।

গৃহিণী ব্যাপারটা যত সোজা ভাবিলেন, রামলোচন তেমন ভাবিলেন না। নরেন যদি মঞ্জরীকে সত্যই ভালোবাসিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার সহিত বিবাহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত

করা সহজসাধ্য হইবে না। এখন তাঁহার পুত্র যদি পিতার নির্ব্বাচিত পত্নী গ্রহণ না করে তবে উপায়? এই সব কথা চিন্তা করিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। নিজকৃত দোষের একটা মর্ম্মান্তিক অনুশোচনা হৃদয়কে পীড়িত করিতে লাগিল। কিন্তু দোষ যখন মূর্ত্তি লইয়া দেখা দিয়াছে তখন তাহার বিনাশসাধন কষ্টসাধ্য হইলেও একেবারে হতাশ হইলে চলিবে না, এই বলিয়া তখনকার মতো মনে ভরসা বাঁধিলেন।

জননী একদিন পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন —"বাবা নরেন! আমার অনেক দিনের সাধ, তোর বিয়ে দিয়ে একটি বউ এনে ঘরসংসার করি, একটি মেয়ে দেখেছি খুব সুন্দরী, বলিস্‌তো বিয়ের ঠিক করি।"

নরেন বলিল—"বিয়ের কথা এখন তুলো না মা! সামনে পরীক্ষা আসছে।"

মা বলিলেন—"বাবা, আমি আশীর্ব্বাদ

করছি, তোর পরীক্ষার ফল ভালোই হবে। আমার কথা রাখ্, বিয়ে কর্।"

নরেন বলিল—"না, মা, সে এখন কিছুতেই হতে পারে না, ঐ সব গোলমাল জুটিয়ে আমার পরীক্ষাটা মাটি করে দিয়ো না।"

গৃহিণী ভাবিলেন, পরীক্ষার কথা ওজরমাত্র। পুত্র মঞ্জরীর রূপে তন্ময় হইয়া আছে। এখন সে তন্ময়তা ভাঙিতে হইলে আর একটি অধিকতর রূপসী চোখের সমুখে ধরা আবশ্যক, তাই বলিলেন—"মেয়ে নিখুঁৎ সুন্দরী, —একবার দেখ্‌বি!"

নরেন সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল—"আমার বক্তব্য যা বলেছি—দুটি পায়ে পড়ি মা, আর বিরক্ত কোরো না।"

গৃহিণী মনে করিলেন, বেশি পীড়াপীড়িতে নরেন হয়ত একটা কাণ্ড করিয়া বসিবে, তাই আর কিছু না বলিয়া চাপিয়া গেলেন।

স্ত্রীর নিকট হইতে পুত্রের বিবাহে

অনিচ্ছার কথা শুনিয়া রামলোচন চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। যতই তাঁহার মনে হইতে লাগিল নরেন বিবাহ না করিবার জন্য জেদ করিতেছে ততই বিবাহ দিবার জন্য তাঁহারও জেদ বাড়িতে লাগিল—বিবাহের বিপক্ষে যে মত ছিল তাহা কোথায় উবিয়া গেল!

তাঁহার মনে একবার প্রশ্ন উঠিয়াছিল, নরেন যদি সত্যই মঞ্জরীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকে তাহা হইলে অন্য মেয়ের সহিত বিবাহ দেওয়াটা কি ভালো হইবে? ছেলের জীবন চিরদিনের জন্য অসুখী করিয়া তুলিবেন না তো? কিন্তু তাঁহার বিচক্ষণ বুদ্ধি পরামর্শ দিল,—বালকের প্রণয় কেবল চোখের নেশা; বিবাহিত জীবনের আবর্ত্তে পড়িলে দুই দিনেই তাহা ছুটিয়া যাইবে, তাহার জন্য ভাবনা নাই। এখন যাহাতে সে অপরিণত বুদ্ধির বিভ্রমে পড়িয়া অপকর্ম্ম করিয়া না বসে তাহাই দেখিতে হইবে! পুত্রের অজ্ঞানকৃত

ভুল পিতা যদি নিজ হস্তে সংশোধন না করিয়া, তাহার প্রতি ঔদাসিন্য প্রকাশ করেন, তাহা হইলে পিতৃকর্ত্তব্য অবহেলা করা হইবে যে! কিন্তু নরেন যদি তাঁহার শাসন অগ্রাহ্য করে? করে তো আর কি করিবেন? তাই বলিয়া, আপত্তির আশঙ্কায় চেষ্টা ত্যাগ করিতে পারা যায় না।—চেষ্টা তাঁহাকে করিতেই হইবে।

তখন স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ আঁটিয়া স্থির করিলেন যে ছেলের বিবাহের সকল উদ্যোগ গুপ্তভাবেই করিতে হইবে। শেষে জিনিসটাকে এতদূর পাকা করিয়া পুত্রের কাছে উপস্থিত করিবেন যে, তখন বিরুদ্ধাচরণ করা তাহার পক্ষে সহজ হইবে না। তাঁহারা দুজনে মিলিয়া তখন পুত্রকে আবদ্ধ করিবার জন্য তাহার চারিদিকে নানা প্রলোভন ও আকর্ষণ দিয়া একটা মায়াজাল রচনা করিতে লাগিলেন।

(৭)

নরেন পাশ হইবার পর, একেবারে সমস্ত ঠিক করিয়া তাহার পিতামাতা যখন বিবাহ-প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন তখন সে রাজি হইয়া গেল। রামলোচন ও তাঁহার পত্নী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন!

রামলোচনের পত্নীর মুখে এখন এক কথা। তিনি বার বার করিয়া স্বামীকে শুনাইয়া বলিতেছেন—"আমি বলেচি যদি অদৃষ্টে থাকে তো নরেনের বিয়ে কেউ ঠেকাতে পারবে না।" তাঁহার মুখে আর হাসি ধরে না। বহুদিনের আশা ফলবতী হইবে, শুভা তাঁহার ঘরে আসিতেছে, এই আনন্দে তিনি আত্মহারা! কুহকিনী মঞ্জরী তাঁহার ছেলেকে ভুলাইয়া গ্রাস করিবার চেষ্টায় ছিল, তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া আনিতে পারিয়াছেন এই ভাবিয়া মনে একটা পরম তৃপ্তি বোধ করিতেছিলেন।

তিনি মনে করিতেছিলেন ছেলের বিবাহ ভালোয় ভালোয় চুকিয়া যাউক, বউ আসিয়া মঞ্জরীকে দেখাইবেন, তাহার মায়াবিকতা কেমন তিনি চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

নরেন বিবাহে আর আপত্তি না করায় রামলোচন বাবু কতকটা সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার একটা ঘোরতর দুর্ভাবনা কাটিয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু এতদিনের সংকল্প ভাঙিয়া যাওয়ায় মনে তেমন সুখ ছিল না।

বিবাহের আয়োজন-উদ্যোগের কাজ-কর্ম্মে গৃহিণী যখন ব্যস্ত তখন নরেন আসিয়া মাকে বলিল—"মা! এক টুকরো কাগজ খুঁজে পাচ্ছিনা, তুমি রেখেছ কি?"

গৃহিণী বলিলেন—"কি কাগজ বাবা!"

নরেন বলিল—"একখানা চিঠি।"

মা বলিলেন—"কার চিঠি?"

নরেন একটু থতমত খাইয়া গেল। সে মঞ্জরীর উদ্দেশে লিখিত চিঠিখানা খুঁজিতে

আসিয়াছিল। মাতার সমক্ষে প্রণয়-লিপির কথাটা উল্লেখ করিতে তাহার কেমন বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। একটু আম্‌তা আম্‌তাস্বরে বলিল—"মঞ্জরী ব'লে উপরে লেখা আছে।" মঞ্জরীর বিশেষণটা বলিতে লজ্জা করিতে লাগিল।

মা একটু রাগের ভাব দেখাইয়া কহিলেন—"সে চিঠি আমি রেখেছি। তোর আর তাতে দরকার কি?"

নরেন মাথা চুলকাইয়া বলিল—"বিশ্ব-দর্পণের সম্পাদক আমায় একটা উপন্যাসের জন্য বড় তাগাদা দিচ্ছেন; গল্প একটা লেখা আছে—তার সব পাতাগুলো পাচ্ছি, কেবল একখানা পাচ্ছিনা।'

মা বলিলেন—'সে চিঠিতো মঞ্জরীকে লিখ্‌ছিলি, তোর উপন্যাসের সঙ্গে তার কি?"

নরেন ধীরে ধীরে কহিল—"মঞ্জরী আমার উপন্যাসের নায়িকা!"

পাশের ঘরে রামলোচন ছিলেন। তিনি এই কথা শুনিয়া আলুথালুভাবে ছুটিয়া আসিলেন। বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া কহিলেন—"অ্যাঁ! মঞ্জরী উপন্যাসের নায়িকা!"

দেবতার কোপ

নিখিলনাথ বড়ই গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিল। সংসারের মধ্যে যাহারা আমোদ-আহ্লাদ, হাসি-ঠাট্টার প্রশ্রয় দেয় সে তাহাদিগকে পাপী বলিত। বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বত্রই একটা উদার গাম্ভীর্য্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, যে সেই গাম্ভীর্য্য নষ্ট করে সে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য করে, তাহা পাপ। এই সারবান তত্ত্বটা নিখিলনাথ অতি অল্প বয়সেই আবিষ্কার করিয়াছিল। তাই সে নিজে সদাসর্ব্বদা গম্ভীর হইয়া থাকিত। একটা হাসির কথা শুনিয়া পেটের ভিতরে বত্রিশটা নাড়ি যখন ছিঁড়িবার উপক্রম করিত, তখনো সে অতি কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া রাখিত, হাসিত না।

অদৃষ্টক্রমে তাহার পত্নী সুরবালা ঠিক বিপরীত প্রকৃতির হইয়াছিল। তাহার অধর-প্রান্তে হাসির রেখাটুকু লাগিয়াই আছে ; কথায় কথায় পরিহাস ; আর বড়ই আমোদপ্রিয়।

এই দুইটি প্রাণী সাংসারিক বন্ধনে এক হইলেও, প্রকৃতির বিভিন্নতার জন্য তাহাদের হৃদয়ের মিলন অসম্ভব হইয়া উঠিতেছিল ; —পরস্পর পরস্পরকে কিছুতেই নিজের মনের মতো করিয়া তুলিতে পারিতেছিল না।

বন্ধুবান্ধবের সহিত ক্বচিৎ-কখন হাসি ঠাট্টা করিলেও করা যাইতে পারে কিন্তু স্ত্রীর সহিত একেবারেই না ; যেহেতু স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ অতি পবিত্র এই ছিল নিখিলনাথের কাছে সব চেয়ে বড় কথা। তাই সে কখনো স্ত্রীর চপলতা নির্ব্বিকার চিত্তে প্রশ্রয় দিত না। সুরবালা যখন স্বামীর সমক্ষে একটা সামান্য কথা হাবে ভাবে কটাক্ষে ও পরিহাস-রসসংযোগে বেশ সরস করিয়া তুলিত, তখন

নিখিলনাথ সেটা একটু মিঠা হাসিতে আমো রঙাইয়া না তুলিয়া একটা ক্রোধপূর্ণ উদাসদৃষ্টিতে চাহিয়া তাহা ভস্ম করিয়া দিত। নিখিলনাথ ভাবিয়াছিল, এইরূপ বারম্বার বাধা দিয়া সে সুরবালার রহস্য-প্রবৃত্তির বীজ মন হইতে একেবারে উন্মূল করিয়া দিতে পারিবে; কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও সুরবালার প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে পারিল না। তাহার প্রতি এতটুকু অনুরাগ দেখাইলে পাছে তাহার উদ্দাম রহস্য-প্রবৃত্তি প্রশ্রয় পায়, সেই জন্য সে পত্নীর সহিত বড় ভালো করিয়া ব্যবহার করিত না। অনেক সময় তাহাকে অত্যন্ত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিত। স্ত্রীর সহিত এমনি ভাবে চলিত যে বোধ হইত সে যেন মনে করে বিধাতার সৃষ্ট অসংখ্য বস্তুর মধ্যে তাহার স্ত্রীও একটি পদার্থ, অন্য জিনিসের চেয়ে তাহার উপর বেশি অনুরাগ দেখাইবার আবশ্যক কি!

নিখিলনাথ যখন এই তাচ্ছিল্য ভাব অতিমাত্রায় বাড়াইয়া তুলিল তখন তাহার স্ত্রীর সন্দেহ হইতে লাগিল যে স্বামী তাহাকে নিশ্চয় ভালোবাসে না—নইলে এত অনাদর কেন! নিখিল যে স্ত্রীর এ সন্দেহটা বুঝিত না তাহা নহে, তবে কর্ত্তব্যের কঠোর আদেশ-পালনে পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র সে নহে। যখন এক একবার স্ত্রীকে সাদরে বক্ষে টানিয়া লইবার ইচ্ছা হইত তখন সে সেই আবেগস্রোত প্রাণপণে রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিত।

(২)

নিখিলনাথের লেখাপড়া যখন শেষ হইয়া গেল তখন সে যে কি করিবে তাহা সহজে ঠিক করিতে পারিল না। চাকরী সে প্রাণান্তে করিবে না, ওকালতী ডাক্তারীতে

আজকাল তেমন পসার নাই, ব্যবসা করিতে হইলে আগে তাহা শিক্ষা করা প্রয়োজন, নইলে লোকসানের ভয়, কাজেই তাহার পক্ষে কোনটাই সুবিধাজনক ছিল না; গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তাও তেমন বলবতী নহে, সেইজন্য তাহার আর কোন পথ অবলম্বন করা হইল না।

ছেলেবেলা হইতে তাহার একটু রচনার সখ ছিল। সে দার্শনিক গবেষণাপূর্ণ কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই লিখিবার ঝোঁকটা খুব বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

লেখাপড়া শেষ হইলে নিখিলের করিবার যখন আর কিছুই রহিল না তখন সে প্রবন্ধ ও কবিতা রচনায় মাতিয়া উঠিল। ইহা ছাড়া আরো একটি কাজে সে অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিল,—তাহা দেশের কাজ। মিটিং, বক্তৃতা, চাঁদার

খাতা তাহাকে এত ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল যে, সমস্ত দিনের মধ্যে আহার ও নিদ্রার সময়ও কুলাইয়া উঠিত না। দেশের হিতকল্পে একটা-না-একটা অনুষ্ঠান তাহাকে সর্ব্বদা অধিকার করিয়া রাখিত, অন্য কিছু করিবার ও ভাবিবার অবসর দিত না। স্বদেশ-চিন্তা তাহার হৃদয় হইতে ক্রমে ক্রমে সুরবালার মূর্ত্তিটা একেবারে চাঁচিয়া ফেলিতেছিল।

সুরবালা স্বামীর মন নিজের দিকে ফিরাইবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিত; কিন্তু কিছুতেই সফল হইত না, বরং তাঁহার দর্শন পর্য্যন্ত ক্রমেই দুর্লভ হইয়া উঠিতে লাগিল। সে যখন স্বামীর নিকট হইতে একটু আদর লাভ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া বসিয়া থাকিত, তখন দেখা যাইত নিখিলনাথ সমাজসংস্কারের একটা জটিল প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামাইতেছে! বেশভূষার আড়ম্বরে স্বামীকে সে যতই আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিত, নিখিলনাথের

মন একটা মহৎ ত্যাগ ও বৈরাগ্যের কল্পনার আশ্রয়ে ততই শূন্যমার্গে উঠিতে থাকিত।

যেদিন নিখিলনাথ বাড়ি থাকিত, দুপুর-বেলা অভিভাবকদের লুকাইয়া সুরবালা একটু প্রেমালাপের জন্য স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিত। দেখিত, হয় তাহার স্বামী প্রবন্ধ-রচনায় ব্যস্ত নয় কোনো বই লইয়া পাঠে মগ্ন! সে কি করিবে? নিখিলনাথের কি এমন একটু অবসর নাই যে তাহার সহিত দুদণ্ড দুটা কথা কহে? সে স্বামীর পিছনে দীনভাবে অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত—যদি সে করুণা করিয়া একবার তাহার দিকে চাহে! একবার একটু আদর করিয়া কথা কহে! তাহা হইলে সব দুঃখ তাহার নিমেষের মধ্যে ঘুচিয়া যায়। কিন্তু নিষ্ঠুর সে একবারো ফিরিয়া তাকায় না! তবে সে কেমন করিয়া স্বামীকে নিজের পানে ফিরাইবে? সে যে ফিরিতে চাহে না, সে যে

মানে না, শোনে না! কেবল তাহাতে ছাড়া পৃথিবীর অসংখ্য সামগ্রীতে যে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ! সেই দৃষ্টিকে তাহার মতো একটা সামান্য রমণীর পানে কিসের জোরে ফিরাইবে? সে চৌম্বক শক্তি সে কোথায় পাইবে? সুরবালা ভাবিয়া কূল পাইত না। যতই দিন যায় সে দেখে তাহাদের উভয়ের মধ্যে যেন কিসের একটা ব্যবধান গড়িয়া উঠিতেছে; —স্বামীকে যেন আর সে হৃদয়ের নিকটে পাইতেছে না। ইহার কারণ কি তাহা সে কিছুতেই ঠিক করিতে পারিত না। কি তাহার অপরাধ? সে কোন্ ত্রুটির জন্য এই শাস্তি ভোগ করিতেছে? স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে তো বলে না, —তাচ্ছিল্য করিয়া উড়াইয়া দেয়। তবে সে কি করিবে? কে তাহাকে বলিয়া দিবে—কেমন করিয়া স্বামীর ভালোবাসা পাওয়া যায়!

এমনি করিয়া দিন যাইতে লাগিল।

সুরবালার মুখে আর সে হাসি নাই—তাহার সে বাচালতাও নাই,—দিন দিন সে ম্লান হইয়া যাইতেছে। নিখিলনাথ তাহা লক্ষ্য করিয়া আনন্দ বোধ করিল। সে ভাবিল তাহার ঔষধ ধরিয়াছে! এ সময় একটু শিথিলতা দেখাইলে পাছে সুরবালার পূর্ব্ব-প্রকৃতি ফিরিয়া আসে সেইজন্য সে খুব সাবধান হইয়া রহিল;—গাম্ভীর্য্যের মাত্রা পূর্ব্বের চেয়ে দ্বিগুণ বাড়াইয়া তুলিল। তাহাতে সুরবালার দুঃখের অবধি রহিল না।

(৩)

একদিন ঘর পরিষ্কার করিতে করিতে নিখিলের লেখা একখানা কবিতার খাতা সুরবালার হাতে আসিয়া পড়িল। সেখানা সে বিস্ময় ও উৎকণ্ঠার সহিত একনিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল। পড়িয়া চক্ষু স্থির! এক্স-রশ্মি

দ্বারা বাহ্যাবরণ অতিক্রম করিয়া ভিতরটা শুদ্ধ যেমন দেখা যায় তেমনি করিয়া আজ এই কবিতার খাতার সাহায্যে সুরবালা স্বামীর হৃদয়টা খুব স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইল; —দেখিল সে হৃদয়ে তাহার স্থান নাই, আর এক কে রমণী সমস্ত হৃদয়টা জুড়িয়া বসিয়া আছে! নিখিল তাহার প্রতি কেন এমন ব্যবহার করে—কেন এত অনাদর, এত তাচ্ছিল্য করে সেকথা এতদিন সে শতচেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারে নাই, আজ তাহার একটা অর্থ চোখের সামনে সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল!

নিখিলনাথের সমস্ত কবিতাই জন্মভূমির উদ্দেশে লেখা। কল্পনাতেও নিখিলনাথ কোন প্রেমিকার প্রেমবিহ্বলতা প্রকাশ করিয়া আপনার গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ করে নাই। কিন্তু অনেকস্থলে জননীর পরিবর্ত্তে দুঃখিনী রমণী বলিয়া নিখিল মাতৃভূমির জন্য আক্ষেপ করিয়াছিল।

সুরবালার জানিবার ইচ্ছা হইতেছিল, কে সেই দুঃখিনী রমণী যাহার উদ্দেশে তাহার স্বামী হৃদয়োচ্ছ্বাসে এমন সব সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিয়াছে! নিখিল কবিতায় যেমন বাছা-বাছা কথাগুলি সাজাইয়াছে অন্ততঃ তাহার একটা কথা যদি জীবনের মধ্যে একদিন তাহার প্রতি প্রয়োগ করিত, তাহা হইলে সে কৃতার্থ হইয়া যাইত;—তাহার আর কোনো দুঃখ থাকিত না।

(৪)

যে বিপদ এতদিন শুধু আশঙ্কার মধ্যে ছিল, আজ সে সত্য হইয়া দেখা দিয়াছে। সুরবালা এখন কি করিবে? কাহার নিকট সে এই বিপদের কথা বলিবে?—কে তাহাকে উদ্ধারের পথ বলিয়া দিবে? কি করিলে সে স্বামীর ভালোবাসা ফিরিয়া পাইবে

সুরবালা কিছুই ঠিক করিতে পারিল না; কেবল অধীরতা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া যখন কিছু ঠিক হইল না, আশঙ্কায়, সন্দেহে ব্যথায় সমস্ত হৃদয়টা যখন কেবল জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, সে তখন আর কাহাকেও চোখের সামনে না দেখিয়া তাহার চিরজীবনের সঙ্গী বুড়ী ঝির কাছে চলিল;—বুড়ী ঝি তাহাকে মানুষ করিয়াছে। প্রথম প্রথম শ্বশুর-বাড়িটা যখন বড়ই অপরিচিত স্থান বলিয়া মনে ঠেকিত, তখন এই শৈশবের সঙ্গিনী বুড়ী ঝি সুরবালার একমাত্র পরিচিত আশ্রয় ছিল,—মনে একটুমাত্র কষ্ট হইলে সে তখনই এই বুড়ী ঝির বুকে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িত! আজও তাই সে বুড়ী ঝির কাছে গেল। তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঝি মনে করিল শাশুড়ী বুঝি বকিয়াছে তাই এই কান্না!

সে সুরবালাকে কত আদর করিল, কত উপদেশ দিল কিন্তু কিছুতেই সে প্রবোধ মানিল না। বুড়ী ভাবিল তবে একটা কিছু গুরুতর ঘটিয়াছে। সে তখন সুরবালার মাথাটা কোলের উপর টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল। কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বল দেখি সুর, কি হয়েছে ?" সুরবালা ঝির কাছে কখনো কোনো কথা গোপন করে নাই, সে তো তাহাকে শুধু দাসীর মতো দেখিত না, সে যে তাহার মায়ের মতন। লজ্জাজড়িত অতি গোপন কথাটিও সে শুনিতে পাইত। সুরবালা অকপটে নিখিলনাথের সমস্ত কথা তাহার কাছে খুলিয়া বলিল।

ঝি শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। সুরবালার দুরদৃষ্টের কথা ভাবিয়া তাহার নয়ন সজল হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল,—"নিখিল কি তোরে আদর যত্ন করেনা ?"

"আদর যত্ন ?—ভাল করে দুটো কথাও বলেনা।"

"সত্যি নাকি ?"

সুরবালার মুখ দিয়া আর কোনো কথা বাহির হইল না—সে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বুড়ী বলিল—"কাঁদিসনে থাম। আমি উপায় করচি !"

সুরবালা বলিল—"কি উপায় করবি ?"

বুড়ী বলিল—"সে আছে ;—দেবতার দুয়োরে গিয়ে পড়তে হবে। মানুষের সাধ্যি নেই কিছু করে !"

সুরবালা কথাটা ভাল বুঝিতে পারিল না, বলিল—"কি বলিস্ তুই !"

বৃদ্ধা তখন সব কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়া বলিল,—"শুনিস্ নি কি, ওষুধ করার কথা ?"

সুরবালা বলিল—"ওষুধ কি ?"

"সে খাওয়ালে অবাধ্য সোয়ামী বশ হয় —সে দেবতার স্বপ্নদত্ত।"

"কোথায় পাওয়া যায় ?"

"ধনপুরের পঞ্চানন ঠাকুর জাগ্রত দেবতা ! পৃথিবীসুদ্ধ লোক জানে !"

বৃদ্ধা তখন অসংখ্য উদাহরণ উল্লেখ করিল, তাহার পরিচিত কত স্ত্রীলোক এই পঞ্চানন ঠাকুরের ওষুধ লইয়া স্বামীকে হাতের মুঠার মধ্যে আনিয়াছে তাহা বর্ণনা করিল। ঐ উপায়ে নিজের অবাধ্য স্বামীকে সে কী রকম বশে আনিয়াছিল, সে কথাও বলিতে ভুলিল না।

বৃদ্ধার কথায় সুরবালা আশ্বস্ত হইল। তাহার মনে হইল বিপদ হইতে উদ্ধারের একটা ভালো উপায় মিলিয়াছে। বুড়ী যখন বলিতেছে তখন তাহাতে সন্দেহ কি ! সে জানিত ঝি তাহাকে ভালোবাসে—সে যাহা করে তাহাই তাহার মঙ্গল। তাহার দ্বারা

কোনো বিপদের ভয় নাই। তাই সে কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া বুড়ীর কথায় রাজি হইয়া গেল।

বৃদ্ধা সেই দিনই ওষুধ আনিতে বনপুর অভিমুখে রওনা হইল।

(৫)

যথাসময়ে পঞ্চানন-দেবের মহৌষধ লইয়া বুড়ী বনপুর হইতে বাড়ি ফিরিল, এবং যথা-নিয়মে তাহা মন্ত্র পড়িয়া ও কৌটায় পুরিয়া সুরবালার হাতে আনিয়া দিল এবং চুপে চুপে কহিল,—"বারবেলায় খাওয়াতে হবে, বুঝলি! জামাইবাবুর চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিস্,— খাওয়াতে মাত্র দেখবি হাতের মুঠোর মধ্যে এসেছে। পঞ্চাননঠাকুরের ওষুধ—এ পীর-প্যাকম্বর নয়, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী!—তুই এগো, আমি গরমজল নিয়ে আসছি। দেখিস, চুলটা এলিয়ে তবে ওষুধ ঢালবি, ভুলিসনে।"

বুড়ী গরম জল আনিতে গেল। ওষুধের কৌটা হাতে লইয়া সুরবালা ধীরে ধীরে তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। কই এতদিন যাহার জন্য সে হা-প্রত্যাশ করিয়া ছিল তাহা হাতে পাইয়া তাহার হৃদয় তো আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিল না। বরঞ্চ একটা অজ্ঞাত আতঙ্ক আসিয়া যেন তাহার হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল। গৃহের যে দেয়ালের ধারে একটি ছোট টেবিলে স্বামীর জন্য চায়ের সরঞ্জাম সাজানো ছিল, সেইখানে আসিয়া ক্ষণকাল সে বিমর্ষ ভাবে শূন্য পেয়ালার দিকে চাহিয়া রহিল। যখন দেখিল, বুড়ী কেটলীহস্তে গৃহে প্রবেশ করিতেছে তখন অপরাধীর মত তাড়াতাড়ি কৌটার গুঁড়া পেয়ালায় ঢালিয়া দিল। ঘরে আসিয়া বুড়ী কেটলীটা ভূমে রাখিয়া আবার চুপে চুপে তাহাকে কহিল,—"এইবার চা তৈরি কর, আমি ভুতোকে এখানে পাঠিয়ে শিল নোড়াটা ভাল করে ধুয়ে রেখে আসি।"

সুরবালা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ধীরে ধীরে যে পেয়ালায় ঔষধ ঢালিয়াছিল তাহাতে চা ঢালিল। কিন্তু চাকর আসিয়া যখন বাবুর জন্য চা চাহিল, তখন তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, হাত কাঁপিতে লাগিল। সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল যেন বাল্যকালে একবার শুনিয়াছিল যে, একজন ঔষধে স্বামী বশ করিতে গিয়া কি একটা বিভ্রাট ঘটাইয়াছিল। তাড়াতাড়ি সে আর-এক পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া চাকরের হাতে দিল।

চাকর চলিয়া গেলে সে রুদ্ধনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে কহিল,—"হে ঠাকুর, ক্ষমা কর, তুমি দয়া করিয়া যাহা দিয়াছ তাহা আমার ভাগ্যের জন্যই দিয়াছ, আমি তাহা ফেলিব না, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিব। যদি ক্ষতি না হয় তাঁহাকেই দিব। আর যদি কোন ক্ষতি হয়? মৃত্যুর অধিক আর ক্ষতি কি হইবে? মৃত্যুতে আমার কি ভয়?

ভগবান তাহাই হউক, সেই প্রসাদই আমি ভিক্ষা চাহি। আর যেন স্বামীর অবহেলা চক্ষে দেখিতে না হয়।”

ভাবিতে ভাবিতে সুরবালা সেই ঔষধ-মিশ্রিত চা এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। তাহার পর বিছানায় শয়ন করিয়া শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

(৬)

ঘুমাইয়া সুরবালা স্বপ্নে দেখিল, নিখিল-নাথের আর সে ভাব নাই, তাহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সে তাহাকে কত আদর সোহাগ করিতেছে। নিখিলনাথ একবার বাহু দুটি প্রসারণ করিয়া সুরবালাকে বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইল। সুরবালার বোধ হইল, জীবনে সে এতটা আনন্দ কখনো অনুভব করে নাই।

হঠাৎ কি একটা যন্ত্রণায় তাহার ঘুম

ভাঙিয়া গেল। সুরবালার মনে হইল তাহার সর্ব্বাঙ্গে কে যেন প্রহার করিতেছে। সে চীৎকার করিয়া উঠিয়া বসিল।

নিখিলনাথ এই সময় তাঁহার হারানো খাতার অনুসন্ধানে এইখানে আসিয়াছিল। অসময়ে সুরবালাকে নিদ্রিত দেখিয়া তাহার মনে একটু চিন্তার উদ্রেক হইল। ভাবিল, কোনো অসুখ করে নাই তো? নিকটে আসিয়া কপালে হাত দিবামাত্র সুরবালা চীৎকার করিয়া উঠিয়া বসিল। নিখিলনাথের মুখের দিকে অপরিচিতের ন্যায় ভয়বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—"কে তুই?"

সে স্বর পরিহাসের স্বর নহে, সে হাসি সাধারণ হাসি নহে।

নিখিলনাথ সকাতরে কহিল,—"আমি —নিখিলনাথ! তুমি এমন করছো কেন? কি হয়েছে?"

এইকথা বলিয়া নিখিল শয্যার পার্শ্বে বসিয়া

তাহাকে সাদরে বক্ষে টানিয়া লইতে গেল। বহুদিনের রুদ্ধ আবেগ-স্রোত আজ বন্যার প্লাবনের মতো আসিয়া তাহার হৃদয়কে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সুরবালা সেই প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গনের মধ্যে ধরা দিল না! স্বামীর সেই প্রেমের সম্ভাষণ কঠোর ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া ভীতকম্পিতকণ্ঠে কহিল —"তুই নিখিলনাথ? কক্ষনো না। সর বলছি,—নইলে তোকেও বিষ খাওয়াব।"

নিখিলনাথের চক্ষে জল আসিল! তাহার সন্দেহ হইতে লাগিল বোধ হয় সুরবালা পাগল হইয়াছে। নইলে এমন করিয়া কথা কয় কেন? এমন করিয়া হাসে, এমন করিয়া চাহে কেন? সুরবালার এই অবস্থা দেখিয়া তাহার প্রাণটা যেন বাহির হইয়া যাইতে চাহিল। তাহার মনে হইল সে নিজেই তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে! —অনুশোচনায় তাহার প্রাণটা জ্বলিয়া যাইতে

লাগিল! তাহার মনে হইতে লাগিল—হায়! হায়! কি করলুম! কি করলুম! ভগবান কি করিলে সুরবালার মুখে আবার সেই পরিহাসের হাসি ফুটিয়া উঠে! সেজন্য নিখিলনাথ যে তাহার সমস্ত গাম্ভীর্য্য ত্যাগেও প্রস্তুত!

বুড়ী ঝি সুরবালার অবস্থা দেখিয়া হাহাকার করিতে করিতে ঠাকুরঘরে ঢুকিল। সেখানে গৃহতলে মাথামুড় খুঁড়িয়া কহিল—"কি দোষ হয়েছে বাবা,—কি অপরাধে এমন ঘটালি! আমি তো সব রীত পালন করেছি! তিনবার মন্ত্র পড়ে উপর দিকে চেয়ে তবে শিকড় গুঁড় করেছি, তবে কি দোষে তুই এমন ঘটালি বাবা!"

সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল,—সুরবালার কেশ তো সে এলায়িত দেখে নাই। এই দোষেই যে ঠাকুর সর্ব্বনাশ করিয়াছেন সে তখন ঠিক বুঝিল। ঠাকুরের ন্যায়-বিচারের

প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়া পাইয়া সুরবালার প্রতি রাগ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিল,—"কল্লি কি সুর, তুই কল্লি কি! এলোচুলে ওষুধ ঢাল্লিনে! পঞ্চানন ঠাকুর যে জাগ্রত দেবতা! হায় হায়! কি হোল ঠাকুর! এ যাত্রা রক্ষা কর;—আমি এখনি স্বস্ত্যয়ন করাব।"

হুকার জন্ম

মর্ত্ত্য হইতে পঞ্চাশৎকোটি যোজন ঊর্দ্ধে ধূম্রলোক। সেখানে সবই বাষ্পময়;—বায়ু বাষ্পপূর্ণ, সাগর সরিৎ সরোবর বাষ্পে ভরা, পর্ব্বত কেবল বাষ্পস্তূপ মাত্র, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলে বাষ্পাকারে বিরাজ করিতেছে। সেই ধূম্রলোকে একদিন মহা কোলাহল শোনা গেল।

তখন স্বর্গের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বকর্ম্মার সাহায্যে ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন এক রকম শেষ হইয়াছে;—মাথার ভিতর যা' যা' প্ল্যান ছিল, ইট কাট চূণ সুর্কী পাথর প্রভৃতির সমষ্টিতে তা সবই মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। এইবার ব্রহ্মা নাকে সর্ষপ তৈল দিয়া বহু বিনিদ্র রজনীর শোধ তুলিবেন মনে করিতেছেন, এমন সময় এক উৎপাত আসিয়া জুটিল।

ধূম্রলোকবাসী ধূমপায়িগণ সেদিন ধুমধামের সহিত এক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্র তাম্রকূটপত্রে ছাপা বিজ্ঞাপন বিলি করিয়া ধূমপায়ীর দল একত্র করা হইয়াছে। নানা তাম্রকূটাগারসমন্বিত ধূমকেতুধ্বজশোভিত সভাস্থল জনসমাগমে গম্ গম্ করিতেছে, গঞ্জিকা-ধূপে ও চরস-রসে সভাগৃহ আমোদিত! সে দিন সভার আলোচ্য বিষয় ছিল—"ধূমপায়ীর কষ্ট নিবারণ।"

যথানিয়মে হাত তালির চট্পট্-পটাপট্ শব্দে মনোনীত হইয়া সভাপতি আসন গ্রহণ করিলেন। সভার সম্পাদক শ্রোতাদিগের হাতে হাতে তাম্রকূটপত্রে ছাপা রেজোল্যুশনের অনুলিপি বাঁটিয়া দিলেন,—হাততালির শব্দ মিলাইতে না মিলাইতে চতুর্দ্দিকে তাম্রকূটপত্র নাড়ার একটা খস্ খস্ শব্দ উঠিয়া ঘরের বাতাসকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

প্রথম বক্তা দাঁড়াইয়া উঠিয়া মুখের সম্মুখে

রেজোল্যুশন পত্রখানি ধরিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি পাঠ করিলেন ;—"ধূমপানের নিমিত্ত কোন যন্ত্র সৃষ্টি না হওয়ায় ধূমসেবিগণ বহুবিধ অসুবিধা ভোগ করিতেছেন ; এই সকল অসুবিধা দূরীভূত না হইলে ধূমপায়ীর সংখ্যা স্বল্প হইতে স্বল্পতর হইয়া শীঘ্রই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে। এইজন্য আমরা সমস্ত ধূমগ্রাহী একত্র হইয়া এককণ্ঠে ব্রহ্মার সদনে আবেদন করিতেছি যে, তিনি ইহার কোন উপায় বিধান করুন। এই সঙ্গে তাঁহাকে জানান হউক যে, পূর্ব্বোক্ত কারণে ইতিমধ্যে ১৯৯ জন অধিবাসী ধূম্রলোক ত্যাগ করিয়াছেন।"

প্রস্তাবপাঠ শেষ হইলে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ হইল। বক্তা বলিতে লাগিলেন,—"ধূম্রলোচন সভাপতি মহাশয়! ও ধূম্রলোকবাসী ভাই সকল! কেহই অপরিজ্ঞাত নহেন যে ইন্দ্রাদি দেব যেমন জ্যোতিতে

পরিপুষ্ট, মানবজাতি যেমন অন্নে পরিবর্দ্ধিত, তেমনি ধূম্রলোকবাসী যে আমরা, আমাদের এই বাষ্পদেহ প্রচুর ধূম-ধূমায়িত না হইলে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। হবিষানল যেমন দেবতাদিগের, শাকান্ন যেমন মানবদিগের, তেমনি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যবর্ত্তী ধূম্রলোকবাসী আমাদিগের এই যে না-মানব-না-দেব দেহ্ ইহার সংগঠনে ধূম যে নিতান্ত আবশ্যক এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। কালিদাস তাঁহার মেঘদূতে স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে ধূমজ্যোতির সংমিশ্রণে আমাদের এই বিপুল দেহ গঠিত হইয়াছে ; এই বাষ্পময় দেহ লইয়া একদিন আমরা রামগিরি হইতে অলকা, অলকা হইতে রামগিরি, চক্ষের নিমেষে গতায়াত করিয়াছি! সে কিসের বলে? একমাত্র ধূমপানই কি তাহার কারণ নয়?”

“কিন্তু ভাই সব! আমাদের ধূমপানের যে কি কষ্ট তাহা আপনারা সকলেই জানেন।

প্রথম কথা, ধূমপত্র যে পরিমাণে পোড়াই সে পরিমাণে নেশা হয় না; স্তূপীকৃত পত্রে অগ্নিসংযোগ করিয়া তাহার চারিপাশ ঘিরিয়া বসিয়া ধূম গ্রহণ করিতে হয় বলিয়া ধূমের অধিকাংশই বৃথায় যায়,— অতি অল্প পরিমাণ নাক ও মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ভরপুর-নেশায়-পরিপূর্ণ ধূমকুণ্ডলী আমাদিগকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনপূর্ব্বক, মেঘাকারে, হেলিতে দুলিতে বাতাসে ভর দিয়া স্বর্গলোকে চম্পট প্রদান করে, আর আমরা হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকি, না পারি ধরিয়া মুখে পূরিতে না পারি আটক করিতে! হায় হায় একি কম আপশোষ! একি কম ক্ষতির কথা! (করতালি ধ্বনি) শুধু কি তাই? হাঁ করিয়া ধূমগ্রহণ করিতে করিতে মুখের চোয়াল ধরিয়া আসে, বৈদ্য ডাকিয়া ঔষধ মালিস করিতে হয় তবে সে বেদনা যায়। আবার শুনুন, একেলা বসিয়া আরামে যখন খুসি তখন

ধূমপান করিতে পাইনা; একেলার জন্য কখনো এত অধিক পরিমাণে ধূমপত্র পোড়ান যায়? —যে ধূমে পাঁচিশজন ধূম্রলোচন হইতে পারেন, তাহা কি একটি প্রাণীর জন্য খরচ করা যায়? ধোঁয়ার আড্ডায় সকলকে একত্র করিবার জন্য প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হয়। তাহাতে যে কত সময় নষ্ট তাহা কহতব্য নয়। অনেকে হয়ত যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারে না, বেচারাদের আর সেদিন ধূমগ্রহণ করা হয় না; তাহাদের সে কষ্ট দেখিলে চক্ষু ফাটিয়া জল আসে,—মনে প্রফুল্লতা নাই, শরীরে বল নাই, কাজে মন নাই, আহারে অরুচি, কেবল অবসাদ, জড়তা আর অসুস্থতা! সে দিনটা তাহাদের কাছে যেন বিধাতার অভিসম্পাত! হায় হায়! এত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও রীতিমত নেশা জমে কই! ভাই সব! গেল! গেল! সব গেল! ধূম পান গেল! ধূম্রলোক গেল! উপায় করুন।

উপায় করুন! নইলে ধূমপানের ব্যাপার ধূমেই শেষ হইবে।"

বক্তা তাম্রকূটপত্রদ্বারা মুখের ঘাম মুছিতে মুছিতে বসিয়া পড়িলেন। প্রস্তাবটি যথাক্রমে অন্যান্য সভ্যের দ্বারা সমর্থিত ও পরিপোষিত হইয়া শেষে সমগ্র সভা কর্তৃক অনুমোদিত হইল।

ঠায় বসিয়া বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে শ্রোতৃগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সকলেরই শরীরে অবসাদের লক্ষণ দেখা গেল। কেহ গাত্র প্রসারণ, কেহ হস্তোত্তোলন, কেহ বা মুখব্যাদান পূর্ব্বক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া অবসাদ ঘুচাইবার নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাহা সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইল! দেখিতে দেখিতে সভাস্থল হাই-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল,—হাইয়ের অস্ফুট শব্দ ও তৎসংলগ্ন তুড়ি তুড়্ তুড়্ ধ্বনি মিলিয়া এক অপরূপ রবের সৃষ্টি হইল।

কক্ষান্তরে ধূমপত্র সজ্জিত ছিল, তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করা হইল। বর্ষার মেঘের মতো পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া উদ্গীর্ণ হইয়া গৃহ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সেই ধূম্রকুণ্ডলীর মধ্যে আসন পাতিয়া সভ্যমণ্ডলী উপবেশন করিলেন। মুখের হাই মুখেই মিলাইয়া গেল, সেখানে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। শরীরের অবসাদ ঘুচিয়া উৎসাহ আসিল; মন প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিল।

(২)

ধূমপায়িসভার রেজোল্যুশন সকল সভ্যের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইয়া যথাসময়ে ব্রহ্মার নিকট প্রেরিত হইল। ব্রহ্মা পাঠ করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। এতদিন তাঁহার বুদ্ধিতে প্রবেশ করে নাই যে ধূমসেবন-যন্ত্রের কোন আবশ্যকতা আছে। তিনি ভাবিয়াছিলেন সৃজন-কার্য্য শেষ হইয়াছে;

সেই জন্য বিশ্বকর্ম্মার ডিপার্টমেন্টটা তুলিয়া দিবার সংকল্প করিতেছিলেন ; এই মর্ম্মে একটা খসড়াও প্রস্তুত হইয়া আছে, দেবসভার আগামী অধিবেশনে তাহা পেশ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। এমন সময় এই কাণ্ড !

ব্রহ্মার এত ভাবনার আরো একটু কারণ ছিল। এবারকার বজেটে তিনি বিশ্বকর্ম্মার ডিপার্টমেন্টের খরচটা ধরেন নাই ; মনে করিয়াছিলেন সেটা ত উঠিয়াই যাইবে—তবে কেন ? এখন তাহা বজায় রাখিতে গেলে অর্থ যোগাইবেন কেমন করিয়া ? এইরূপ নানা চিন্তায় ব্রহ্মা মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন।

স্থপতিকার্য্য, পূর্ত্তকার্য্য, ও যন্ত্রনির্ম্মাণ প্রভৃতি ব্যাপার আলোচনা করিবার ভার বিশ্বকর্ম্মার উপর ছিল। ধূমপায়িসভার দরখাস্তখানা বিশ্বকর্ম্মার দপ্তরে চালান করিয়া দিয়া ব্রহ্মা তখনকার মতো কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

অনেক দিন হইতে বিশ্বকর্ম্মার হাতে কোনো কাজ-কর্ম্ম নাই; কি করেন, কি করেন ভাবিতেছেন এমন সময়ে সেই দরখাস্তখানা হাতে আসিয়া পড়িল। তিনি আনন্দে বিগলিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কি-রকম-একটা যন্ত্র যে আবশ্যক তাহা চট্ করিয়া তাঁহার মাথায় আসিল না। তিনি নিজে ধূমপান করিতেন না, কাযেই একটা পরিষ্কার ধারণা কিছুতেই হইতেছিল না। অনেক ভাবিয়া শেষে স্থির করিলেন যে, ধূমপায়িসভার সম্পাদকের সহিত একটা মৌখিক আলোচনা করিয়া ব্যাপারটা খোলসা করিয়া লইবেন।

যথাসময়ে বিশ্বকর্ম্মার আপিসের শিল-মোহরাঙ্কিত একখানা সরকারি চিঠি ধূমপায়ি-সভায় সম্পাদকের নিকট পৌঁছিল। তিনি তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া বিশ্বকর্ম্মার আপিসে উপস্থিত হইলেন। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া ধূমপান-প্রণালী সম্বন্ধে

আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার কাছে বিষয়টা ক্রমে ক্রমে বেশ পরিষ্কার হইয়া আসিতে লাগিল;—সহসা তাঁহার মাথায় একটা 'আইডিয়া' প্রবেশ করিল। তিনি কহিলেন,—"আচ্ছা, যন্ত্র আমি তৈরি করিয়া দিতেছি; কিন্তু আপনাদের একটু সাহায্য চাই।"

সম্পাদক আগ্রহসহকারে বলিলেন—"কি করিতে হইবে বলুন। আমরা প্রাণপণে আপনার আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত!"

বিশ্বকর্ম্মা কহিলেন,—"আর কিছু না, কেবল স্বর্গের তিন প্রধান দেবতা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের নিকট হইতে যন্ত্র নির্ম্মাণের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে।"

'যে আজ্ঞা' বলিয়া সম্পাদক প্রস্থান করিলেন।

(৩)

ধূমপায়িগণ তার জনকতক বাছা বাছা লোক মিলিয়া একটা প্রতিনিধিদল গঠিত হইল। তাঁহারা এক শুভদিনে বাষ্পযানে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিলেন। সহস্র যোজন দূর হইতে এক বহুবিস্তীর্ণ সমুজ্জ্বল জ্যোতির্মণ্ডল তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইল, যেন লক্ষ লক্ষ চন্দ্র একত্রে সমুদিত হইয়া অত্যুজ্জ্বল প্রভায় ব্রহ্মলোক মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অর্ ও ণ্য নামক দুইটি সুধা-হ্রদ ব্রহ্মলোককে চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া চলিয়াছে, তাহার তীরে দাঁড়াইয়া ব্রহ্মলোকবাসিগণ আকণ্ঠ সুধাপান করিতেছেন। সেখানকার ভূমি বিচিত্ররত্নময়ী; স্থানে স্থানে হেম অট্টালিকা ও অপূর্ব্ব রত্নময় অসংখ্য দিব্য মন্দির শোভা পাইতেছে। সেই শঙ্খঘণ্টা-কাংস্য-নিনাদিত

মন্দির-মধ্য হইতে ব্রহ্মর্ষিদিগের গম্ভকণ্ঠে গীত সাম গান উত্থিত হইয়া জল স্থল আকাশ মুখরিত করিতেছে, সেই গানের সহিত একতানে ভ্রমরগণ গুঞ্জন করিয়া গান গাহিতেছে; ধূপ-ধুনা চন্দন কস্তুরী কুঙ্কুম ও পুষ্পের সৌরভে দিক্ আমোদিত। বেদবেদাঙ্গপারদর্শী মহানুভব ব্রাহ্মণগণ যথাপদ ও যথাক্ষর ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিতেছেন। বিস্তীর্ণ যজ্ঞকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে হোমানল প্রজ্বলিত তাহাতে বারম্বার আহুতি প্রদত্ত হইতেছে;—আজ্যধূমে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ। ব্রহ্মর্ষিদিগের স্বরলয়সংযোগে বেদাধ্যয়ন-শব্দে ব্রহ্মলোক শব্দায়মান! ধূমপায়িগণ সেই সকল সুমধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শরীর পবিত্র বলিয়া বোধ করিলেন, তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না।

কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন এক-স্থানে মহা জনতা,—দেবাঙ্গনাগণ অমৃতবর্ষী অশ্বত্থতলে দাঁড়াইয়া কলসে কলসে অমৃত

আহরণ করিতেছেন; অন্নময় ও মদকর সরোবরতীরে দক্ষপ্রমুখ প্রজাপতিগণ অতিথিসৎকার করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে তাঁহারা ব্রহ্মার সদনে আসিয়া পৌঁছিলেন। প্রকাণ্ড অগ্নিময় হেম অট্টালিকা! —পদ্মরাগ, নীলকান্ত, অয়স্কান্ত, বৈদূর্য্যমণি ও হীরক, প্রবাল, মুক্তা প্রভৃতি নানা রত্নখচিত অট্টালিকাপ্রাচীরের ঔজ্জ্বল্য তাঁহাদের চক্ষু ঝলসাইয়া দিল। দ্বারে অসংখ্য চতুর্ভুজ প্রহরী। তাহাদের চারি হস্তে চারি প্রকার অস্ত্র বিরাজ করিতেছে।

ব্রহ্মা তখন পূজায় বসিয়াছিলেন। এক প্রহরী আসিয়া তাঁহাদিগকে বৈঠকখানায় বসাইল।

কিছুক্ষণ পরে নামাবলী গায়ে, কমণ্ডলু হাতে, চার কপালে চারটি ফোঁটা কাটিয়া ব্রহ্মা বৈঠকখানায় দেখা দিলেন। সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন

করিল। ব্রহ্মা চতুর্ভুজ তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং সকলকে উপবেশন করিতে আদেশ দিলেন। তাঁহার সদাপ্রশান্ত চতুর্মুখ আজ কেমন বিষাদভারাক্রান্ত!

ব্রহ্মা কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার চার কণ্ঠের গম্ভীর স্বর একসঙ্গে বাহির হইয়া সকলকার ভীতি উৎপাদন করিল। দলের মধ্যে একজন ছোকরা ছিল, সে ব্রহ্মার চার জোড়া ওষ্ঠ একত্রে কম্পিত হইয়া যে একটা অদ্ভুত শব্দের সৃষ্টি করিতেছিল তাহাতে হাসি চাপিতে পারিতেছিল না, তাহার আকর্ণ গণ্ড ক্ষণে ক্ষণে লাল হইয়া উঠিতেছিল।

ব্রহ্মা উৎকণ্ঠিতভাবে কহিলেন,—"যাহা বলিবার আছে চটপট বলিয়া লও। আমার সময় বড় অল্প, হাতে বিস্তর কাজ।"

প্রতিনিধিদলের প্রধান ব্যক্তি তখন তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—"আমরা

আপনার অধিক সময় নষ্ট করিব না। কেবল ধূমপানযন্ত্রসংক্রান্ত দুই চারিটি কথা বলিব; আপনি আমাদের দবগুস্ত—"

ব্রহ্মা বাধা দিয়া বলিলেন—"অত বিশদ বর্ণনার আবশ্যক নাই, মোট কথাটা বল।"

যিনি কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন বাধা পাইয়া থতমত খাইয়া গেলেন, কি বলিবেন সব গোলমাল হইয়া গেল! ফ্যাল্ ফ্যাল দৃষ্টিতে ব্রহ্মার পানে চাহিয়া রহিলেন। ব্রহ্মা তাহা দেখিয়া চটিয়া অস্থির; বলিলেন—"এমনি করিয়া সময় নষ্ট কর! যাও কোন কথা শুনিতে চাই না।"

বক্তা দেখিলেন বিপদ! তিনি তখন নিজেকে সামলাইয়া লইয়া পুনরায় কহিলেন, —"বিশ্বকর্ম্মা আমাদের সভার সম্পাদক—"

ব্রহ্মা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"অত কথা শুনিবার সময় নাই, এখনি স্নানাহার করিয়া আমাকে দেবসভায় যাইতে হইবে,

সেখানে অনেক কাজ আছে। তোমাদের আসল কথাটা কি শীঘ্র বল, নয় ত সময়ান্তরে আসিও।"

দলের প্রধান ব্যক্তি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"না, না, আমি এখনি সারিয়া লইতেছি। শুনুন্ না, বিশ্বকর্ম্মা আশ্বাস দিয়াছেন ধূমপানযন্ত্র তিনি নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন, কিন্তু—"

ব্রহ্মা অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়া বলিলেন —"বিশ্বকর্ম্মা আশ্বাস দিয়াছেন তা' আমার কি?"

সে ভয়ে ভয়ে কহিল—"না, না, তা নয় কিন্তু—"

"কিন্তু কিন্তু করিয়াই আমাকে বিরক্ত করিলে, এত চেষ্টা করিয়াও আসল কথাটা এখনও শুনিতে পাইলাম না, আমি এমন করিয়া আর সময় নষ্ট করিতে পারি না— যাও!" এই বলিয়া ব্রহ্মা গাত্রোত্থান করিলেন।

দলের সেই প্রধান ব্যক্তি অল্পে ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি তখন জোড়করে ব্রহ্মার স্তবগান করিয়া কহিলেন—"হে দেবশ্রেষ্ঠ! হে সৃষ্টিকর্ত্তা! হে পদ্মযোনি! আপনারই অনুগ্রহে আমরা দেহে প্রাণ, নয়নে আলোক, নাসিকায় বাতাস পাইতেছি, আপনারই প্রসাদে জীবন ধারণ করিতেছি, আপনার কৃপায় সর্ব্ববিষয়ে স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতেছি, আপনি আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, ত্রাণকর্ত্তা, সর্ব্বে-সর্ব্বা, আমরা আপনার শ্রীচরণের দাস মাত্র! আপনি আমাদের প্রতি বিমুখ হইবেন না। হে দেব! অধম-দিগের প্রতি করুণা কটাক্ষ করুন।"

ব্রহ্মা স্তবে গলিয়া গেলেন, উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন—"অবশ্য! অবশ্য!" তোমাদের দুঃখ আমার কাছে নয় ত আর কাহার কাছে জানাইবে? বেশ, আমি তোমাদের সমস্ত অভাব দূর করিব;—বল শুনি!"

এই বলিয়া তিনি পুনরায় উপবেশন করিলেন।

তখন তাঁহার সম্মুখে ধূমপানযন্ত্রের বৃত্তান্ত অন্তোপান্ত বলা হইল; শুনিতে শুনিতে তিনি কথায় এত মত্ত হইয়া উঠিলেন যে দেব-সভার কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। বক্তা মধ্যে মধ্যে প্রশংসা গান করিয়া তাঁহার শ্রবণের আগ্রহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

সমস্ত শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—"আমার বাপু যাহা সম্বল ছিল তাহার সবই ব্রহ্মাণ্ড-সৃজনে গিয়াছে। থাকিবার মধ্যে আছে এই কমণ্ডলুটি। ইহা তোমাদিগকে দিতে পারি, যদি কোনো কাজে লাগে;—কিন্তু বিশ্বকর্ম্মাকে বলিও যদি আবশ্যক না হয় ত আমায় যেন ওটি ফিরাইয়া দেন;—ওটি আমার বড় সখের, বড় আদরের, বড় দরকারের।"

(৪)

ধূমপায়িসভার বাষ্পযান একদিন কৈলাস অভিমুখে উড়িয়া চলিল। অসংখ্য জনপদ, নদ, নদী, অরণ্য অতিক্রম করিয়া প্রতিনিধিগণ দেখিলেন সম্মুখে এক রজতশুভ্র পর্ব্বত! দূর হইতে তাহাকে মেঘ বলিয়া ভ্রম হইতেছে! মন্দোদনামক স্বচ্ছতোয় শীতলবারিপূর্ণ-সরোবর সেই পর্ব্বতের পদচুম্বন করিতেছে; তাহারই তীরে নানা বিচিত্রসুগন্ধিপুষ্প-ভারাবনতবৃক্ষাবলিশোভিত এক পবিত্র মনোরম নন্দন কানন! যেখানে যক্ষ রক্ষ কিন্নর গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ নৃতগীতবাদ্যে ও ক্রীড়াকলাপে মত্ত রহিয়াছে। তন্মধ্যে মহাদেবের বাসস্থান।

কৈলাস মধ্যে পরম শান্তি মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজ করিতেছেন,—কোথাও চাঞ্চল্য বা উত্তেজনার লেশমাত্র নাই। সিদ্ধগণ

সংযতব্রত হইয়া তপশ্চরণ করিতেছেন। সেথানকার সকলেই যেন ধ্যানমগ্ন, গম্ভীর, সংযত! সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুসকল দ্বেষাদি ভুলিয়া মৃগয়ূথের সহিত একত্রে ক্রীড়া করিতেছে। বলাকামালায় নভস্তল যেমন সুশোভিত হয়, অতিসুন্দর কামধেনুসকল শ্রেণীনিবদ্ধ থাকায় ঐ স্থান সেইরূপ সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। ঘণ্টাকর্ণ, বিরূপাক্ষ, দীর্ঘরোমা, শতগ্রীব, উরুবক্ত্র প্রভৃতি সহস্র সহস্র ভূতগণ চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে ত্রাসের উদয় হয়।

রুদ্রাক্ষমালাশোভিতকণ্ঠ জটাভারাক্রান্ত দেবাদিদেব মহাদেব বসিয়া বসিয়া স্তিমিতনেত্রে নতমস্তকে ঝিমাইতেছেন, সতীদেবী সম্মুখে বসিয়া পদসেবা করিতেছেন। ঘরের চারিদিকে নানা সামগ্রী ইতস্তত বিক্ষিপ্ত; গোটাকতক শুষ্ক বিল্বপত্র ও ধুতুরাফুল বাতাসে এদিক-

ওদিক করিতেছে, একছড়া মন্দার কুসুমের ছেঁড়ামালা ও একখানা বাঘছাল একধারে পড়িয়া আছে; তাহারই পাশে মহাদেবের ডমরুটি বর্ত্তমান। এককোণে স্তূপীকৃত ছাই:—মধ্যে মধ্যে তাহা পবনতাড়িত হইয়া সতী ও মহাদেবের অঙ্গে আসিয়া লাগিতেছে। অদূরে ভৃঙ্গী একটা প্রকাণ্ড নিমকাঠি লইয়া সিদ্ধি ঘুঁটিতেছে এবং গুন্ গুন্ স্বরে গান গাহিতেছে। মহাদেবের বাহন বলদটা গোয়ালে শুইয়া রোমন্থ করিতেছে, সাপগুলা একটা গর্ত্তের মধ্যে কুণ্ডলী পাকাইয়া নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করিতেছে। নন্দী লগুড়হস্তে বহির্দ্বার রক্ষা করিতেছে, গঞ্জিকাধূমে তাহার চক্ষুদুটা জবাফুলের মতো রক্তবর্ণ।

প্রত্যহ বৈকালে সিদ্ধিসেবন করা মহাদেবের অভ্যাস। এখনও সিদ্ধি না পাইয়া তাঁহার ক্রমাগত হাই উঠিতেছে, মনটা কেমন ফস্ ফস্ করিতেছে! তিনি একবার ভৃঙ্গীকে

হাঁক দিলেন। এমন সময় নন্দী বহির্দ্বার হইতে মহাদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করজোড়ে নিবেদন করিল—"প্রভু! শ্রীচরণ দর্শন আকাঙ্ক্ষায় ভক্তবৃন্দ বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন।"

মহাদেব তাঁহাদিগকে ভিতরে আনিবার আদেশ দিলেন। সতীদেবী স্বামীর পা ছাড়িয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।

অল্পক্ষণ মধ্যে ধূমসেবিসভার প্রতিনিধিদল সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভৃঙ্গী সিদ্ধি ঘোঁটা ফেলিয়া তাঁহাদের বসিবার জন্য ক্ষিপ্রহস্তে বাঘছালখানা পাতিয়া দিল। মহাদেব ভক্তগণকে দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন। কুশলাদি প্রশ্নের পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে ধূম্রলোকবাসিগণ! ধূমসেবনে তোমাদের কোনো ব্যাঘাত ঘটিতেছেনা ত? মর্ত্যের যজ্ঞধূম তোমাদের দিকে নিয়ত পৌঁছিতেছে ত? কেহ কোনপ্রকার উপদ্রব ঘটায় না ত?"

দলের প্রধান ব্যক্তি উত্তর করিলেন —"হে দেবাদিদেব! কলিকালে জম্বুদ্বীপে যজ্ঞকার্য্য বন্ধ বটে কিন্তু কলকারখানা, কলের গাড়ী প্রভৃতি হইতে যে ধূমোদ্গিরণ হয় তাহা বড় কম নয়। উক্ত দ্বীপে বৈদ্যুতিক ব্যাপারের প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে মনোমধ্যে আশঙ্কার উদয় হইতেছে বটে, কিন্তু আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে আজ পর্যান্ত ধূম সেবনে কেহ কোনো ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে নাই; কেবল মধ্যে মধ্যে উন্নতিবিধায়িনা পত্রিকাখানা আমাদের প্রতি কটুবাক্য বর্ষণ করে। আমরা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করি না, প্রতিবাদও করি না! আমরা বৃথা তর্ক করিতে চাহিনা; —কার্য্যের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চাই যে ধূম সেবনে ও ধূমপায়ী সভা হইতে ত্রিলোকের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।"

মহাদেব সাধু সাধু শব্দে এই উক্তির সমর্থন করিলেন।

তখন সেই দলের প্রধান ব্যক্তি উৎসাহিত হইয়া কহিলেন—"কিন্তু দেব! ধূমসেবনের জন্য কোনো যন্ত্র না থাকায় আমাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইতেছে।" এই বলিয়া তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণনা করিলেন। মহাদেব শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহাদের উদ্যমের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কহিলেন—"হে আমার ভক্তবৃন্দ! তোমাদের চেষ্টায় যদি একটা যন্ত্র সৃষ্টি হয় তাহা হইলে আমিও বাঁচি, গঞ্জিকা সেবনে আমারও তেমন সুবিধা হইতেছে না,—ইচ্ছা হয় সমস্ত ধূমটাই গলাধঃকরণ করি, কিন্তু তাহা পারি না।"

দলের প্রধান ব্যক্তি তখন বলিলেন—"হে দেবোত্তম! যন্ত্র নির্ম্মাণ করা অসাধ্য হইবে না, বিশ্বকর্ম্মা আমাদিগকে ভরসা দিয়াছেন। ব্রহ্মার নিকট হইতে কমণ্ডলুটি পাইয়াছি; এখন আপনি কোনো উপকরণ দিলেই হয়।"

মহাদেব উত্তর করিলেন—"দেখ ভক্তগণ, প্রায়ই আমার মনে হয় যে, আমার ডমরুটির দ্বারা জগতের অশেষ উপকার সাধিত হইবে। যখন বাজাই তখন তাহার গম্ভীর রব হইতে যেন অস্ফুট আভাষ পাই—যেন সে আপনি গুমরি গুমরি বলে—'হে দেব, আমার কার্য্যের প্রসার বৃদ্ধি করিয়া দাও, শুধু শব্দ সৃজন আমার চরম লক্ষ্য নয়; আমার অন্য যা গুণ আছে তাহা প্রকাশিত হইতে দাও, কেবল তানমানলয়ের মধ্যে আমাকে আবদ্ধ রাখিও না।' তাই বলিতেছি হে ধূমপায়িগণ! দেখদেখি পরীক্ষা করিয়া আমার অনুমান সত্য কি না। আমার বিশ্বাস ডমরুটি ধূমসেবন যন্ত্রের একটা অত্যাবশ্যক উপাদান হইতে পারিবে।" এই বলিয়া তিনি ভৃঙ্গীকে ডমরু আনিতে আদেশ করিলেন। ভৃঙ্গী তাহা উঠাইয়া আনিল। কাঁধ হইতে গামছাখানা লইয়া তাহার ধুলা ঝাড়িয়া মহাদেবের হাতে দিল।

মহাদেব তাহা গ্রহণ করিয়া মুদ্রিত নয়নে বিভোর ভাবে বাজাইতে লাগিলেন। সে বাদ্য আর থামে না! যতই বাজান ততই তন্ময় হইয়া উঠেন। শেষে এত মাতিয়া উঠিলেন যে তাহার সহিত নৃত্যও আরম্ভ হইল। নাচিতে নাচিতে বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত! তখন ধূমপায়ীরা মনে মনে বিপদ গণিলেন। কারণ মহাদেবের নৃত্য একবার আরম্ভ হইলে কবে শেষ হয় কে জানে!

এমন সময় ভৃঙ্গী সিদ্ধি লইয়া হাজির! অমনি মহাদেবের নৃত্য বন্ধ! তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ভৃঙ্গীর হাত হইতে সিদ্ধির বাটি লইয়া খানিকটা পান করিয়া ভক্তদিগকে প্রসাদ দিলেন। ভক্তগণ প্রসাদ পান করিয়া মাথায় হাত মুছিলেন। ধূমপানে যন্ত্রের কথাটা আর উঠিল না। ধূমপায়ীর দল প্রস্থান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কি জানি আবার যদি নৃত্য আরম্ভ হয়! কিন্তু ডমরুটি

হস্তগত না করিয়া তো যাইতে পারেন না, মহাদেবের কোলের কাছে সেটা পড়িয়া আছে, তিনি তাহা দিবার নামও করেন না। সকলে প্রমাদ গণিলেন। অনেকক্ষণ পরে একজন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন —"হে দেব। তাহা হইলে ডমরুটি লইবার জন্য কবে আসিতে আজ্ঞা করেন?"

মহাদেব একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন —"না, না, ওটা আজই লইয়া যাও! দেখ তো ওটার কথা স্মরণই ছিল না। এই জন্যেই লোকে আমায় বলে—ভোলানাথ।"

(৫)

বিষ্ণু ধূমপায়ীদের উপর হাড়ে চটা ছিলেন। ধূমপায়ী সভা উঠাইয়া দিবার জন্য স্বর্গের কৌন্সিল সভায় অনেকবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেবের

জন্ত তাহা পারেন নাই, তিনি বরাবর বিষ্ণুর প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন। বিষ্ণু তথাপি ছাড়েন নাই; উন্নতিবিধায়িনী পত্রিকায় ধূমপানের বিরুদ্ধে লম্বা লম্বা প্রবন্ধ লিখিয়া বিষয়টাকে সজীব রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এত করিয়াও বিশেষ কোনো ফল হয় নাই;—তাঁহার সমস্ত বাধা সত্ত্বেও ধূমপায়ী সভা দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিতেছিল।

যে দিন প্রতিনিধিদল উপকরণ আহরণের চেষ্টায় তাঁহার প্রাসাদে আসিলেন, বিষ্ণু অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন; প্রহরীকে ডাকিয়া বলিলেন—"যাও বল গিয়া দেখা হইবে না।"

প্রহরীর মুখে এ কথা শুনিয়া ধূমপায়ীর দল পশ্চাৎপদ হইলেন না, তাঁহারা কহিলেন—"তোমার মনিবকে বল যে, আমরা অতি অল্প সময়ের জন্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই।"

প্রহরী প্রভুর অগ্নিমূর্ত্তি দেখিয়া আসিয়া-

ছিল, সে অবস্থায় তাঁহার কাছে আর যাইতে সাহস করিল না, সে বলিল—"বৃথা চেষ্টা! সাক্ষাৎ অসম্ভব!"

এমনি করিয়া তিন তিনে দিন ধূমপায়ী সভার প্রতিনিধিদল বিষ্ণুর বহির্দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহারা এক মতলব আঁটিলেন।

মর্ত্যে সৃজন হইবার পর হইতে সেখানে লীলা খেলা করিবার জন্য স্বর্গের অনেক দেবতা আদিষ্ট হইয়াছিলেন। বিষ্ণুর উপর ভার পড়িয়াছিল যে তাঁহাকে মর্ত্যধামে বংশী-বাদন করিয়া গোপিনীকুলের মনোরঞ্জন করিতে হইবে। বাঁশী বাজানো তাঁহার কখনো অভ্যাস ছিল না, সেইজন্য আজকাল প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা একটা কন্সার্টের আড্ডায় বাঁশী বাজানো শিখিতে যান। ধূমপায়ীরা সে সন্ধান পাইয়াছিলেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা ধূমপায়িদলের একটা

ছোকরা ছদ্মবেশে সজ্জিত হইয়া বিষ্ণুর বাড়ীর সম্মুখে পায়চারি করিতেছিল। সে দিন বিষ্ণু বাঁশীটি হাতে করিয়া যেমনি বাহির হইয়াছেন, অমনি সেই ছোকরা চিলের মত ছোঁ মারিয়া বিষ্ণুর হাত হইতে বাঁশীটা কাড়িয়া লইয়া ছুট দিল—তাহার বাষ্পময় সূক্ষ্মদেহ নিমেষের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকারে কোথায় মিলাইয়া গেল তাহা বিষ্ণু দেখিতে পাইলেন না; তিনি বিরস বদনে বাটীতে ফিরিয়া গেলেন। কন্সার্টের আড্ডায় যাওয়া তাঁহার বন্ধ হইল।

বিষ্ণু শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, ধূমপায়ীদিগের চাতুরীতেই তাঁহার বাঁশীটি খোয়া গিয়াছে। বাঁশীটা জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়াছে সে কথা লজ্জায় দেবসভায় প্রকাশ করিতে পারিলেন না; ধূমপায়ীরাও কি উপায়ে তাহা সংগ্রহ করিয়াছেন অপ্রকাশ রাখিলেন। আসল ব্যাপারটা কেহ জানিল না; সকলে বুঝিল, ব্রহ্মা এবং মহেশ্বরের ন্যায়

বিষ্ণু ও ধূমপান যন্ত্রের জন্য তাঁহার বাঁশীটি দান করিয়াছেন। কিন্তু বাঁশীটি হস্তান্তর হওয়ায় বিষ্ণুর মর্ত্ত্যে আসিবার দিন পিছাইয়া গেল।

(৬)

ব্রহ্মার কমণ্ডলু, বিষ্ণুর বাঁশী ও মহেশ্বরের ডমরু পাইয়া বিশ্বকর্ম্মা যন্ত্রনির্ম্মাণে লাগিয়া গেলেন। এই তিনটি সামগ্রী দর্শনমাত্রেই তাঁহার উদ্ভাবনীশক্তিসম্পন্ন মস্তিষ্কে ধূমপান যন্ত্রের একটি ছায়া পড়িল; তাহারই অনুকরণ করিয়া তিনি একটি কায়া রচনা করিলেন। কমণ্ডলুর মুখের ফাঁদ কমাইয়া ফেলিলেন, বাঁশীর ছিদ্রগুলি বুজাইয়া দিলেন, ডমরুর দুই মুখের চর্ম্ম ফাঁসিয়া গেল, তখন কমণ্ডলুর উপর বাঁশী, বাঁশীর উপর চর্ম্মবিহীন ডমরুটি স্থাপন করিয়া দেখিলেন,—ঠিক হইয়াছে!

স-কলিকা হুকার সৃষ্টি হইল। বিষ্ণু

ক্ষুব্ধ হইলেন, ব্রহ্মা নিশ্চিন্ত হইলেন, মহেশ্বর মহা খুসী। তাঁহার ডমরুটিকে তিনি বাদ্য-জন্ম হইতে মুক্তি দিতে পারিয়াছেন মনে করিয়া তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল। প্রিয় ডমরুটিকে তিনি একভাবে দান করিয়া আর একভাবে গ্রহণ করিলেন। গঞ্জিকা সেবনের জন্য কেবলমাত্র কলিকাটি লইয়া তাহাকে শ্রেষ্ঠত্ব ও অমরত্ব দান করিলেন। সেই অবধি গঞ্জিকা সেবনে কলিকাই প্রশস্ত।

হুকা সৃষ্টি হওয়ার কথা ইন্দ্রের কানে পৌছিল। তিনি ছুটিয়া আসিয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন—"করিয়াছেন কি দেব! সৃষ্টি রক্ষা হইবে কি করিয়া?"

ব্রহ্মা ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"কেন, কেন?"

ইন্দ্র কহিলেন—"মর্ত্ত্যলোকবাসীরা যজ্ঞ-কার্য্য বন্ধ করিয়াছে। তাহার উপর আমার বজ্রটি চুরি করিয়া লওয়া অবধি তাহারা

তাহাকে সব রকম কাজে লাগাইতেছে, অগ্নিদেবকে আর বড় গ্রাহ্য করে না; ধূম অভাবে বরুণ রীতিমত জলবর্ষণ করিতে পারিতেছেন না; তামাকু ব্যবহারের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার হওয়ায় একটু আশার উদয় হইতেছিল; তাহার ধূমও যদি যন্ত্র সাহায্যে টানিয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন, তবে আর উপায় কি? বারি অভাবে পৃথিবী প্রাণিশূন্য হইয়া পড়িবে—আপনার সৃষ্টি রসাতলে যাইবে।"

ইন্দ্রের কথা শুনিয়া ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি জড়িতকণ্ঠে বলিলেন —"তাই ত! তাই ত! ধূম্রলোকবাসীরা ত আমায় এ কথা বলে নাই, তাহারা আমাকে ভয়ঙ্কর ঠকাইয়াছে!"

ইন্দ্র বলিলেন,—"ইহার উপায় বিধান করুন।"

ব্রহ্মা বলিলেন—"নিশ্চয়ই! ধূমপায়ীরা

আমার সঙ্গে যেমন জুয়াচুরি করিয়াছে, আমিও তাহাদের তেমনি অভিসম্পাত দিব। ইন্দ্র! তুমি শঙ্খ আন।"

জলগণ্ডূষ লইয়া ব্রহ্মা তখন শাপ দিলেন—"কোন ধূমসেবী আজ হইতে ধূমপানযন্ত্র-নিঃসৃত সমস্ত ধূম গলাধঃকরণ করিতে পারিবে না,—ধূমের অধিকাংশ তাহাকে ফুঁ দিয়া মুখের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে। যে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিবে সে ধূমপানে কোনো তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবে না, তাহাকে যক্ষ্মাকাশে অকালে দেহত্যাগ করিতে হইবে।"*

---

* যাঁহারা তামাকু সেবন করেন তাঁহারা জানেন যে, ধোঁয়া টানিয়া মুখ হইতে বাহির করিয়া দিয়া তাহা চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে না পাইলে তামাকু খাইয়া কোনো তৃপ্তি হয় না। তাহার কারণ আমার মনে হয় ব্রহ্মার এই অভিশাপ।

তাহার পর একদিন ধূমপায়িসভায় হুকার প্রতিষ্ঠা হইল! চন্দনচর্চ্চিত পুষ্পমাল্যে সুশোভিত হুকার সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া হুকা-শাস্ত্র খুলিয়া সকল সভ্য হুকাস্তোত্র পাঠ করিলেন—"হে হুক্কে! হে ধূমপায়িসভা-সভ্যজনদুঃখহারিণি! হে কুণ্ডলীকৃতধূমরাশি-মুদ্গারিণি! তোমাকে বারম্বার নমস্কার করি, তুমি আমাদিগের প্রতি সদা প্রসন্ন থাক। হে বিশ্বরমে! তুমি বিশ্বজনশ্রমহারিণী, অলসজনপ্রতিপালিনী, ভার্য্যাভৎর্সিতচিত্তবিকার বিনাশিনী; মূঢ় আমরা তোমার মহিমা কেমনে বর্ণিব? তুমি শোকপ্রাপ্ত জনকে প্রবোধ দাও, ভয়প্রাপ্ত জনকে ভরসা দাও, বুদ্ধিভ্রষ্ট জনকে বুদ্ধি দাও, কোপযুক্ত জনকে শান্তিপ্রদান কর। হে বরদে! হে সর্ব্বসুখপ্রদায়িনি! তুমি আমাদের ঘরে অক্ষয় হইয়া বিরাজ কর, তোমার যশঃসৌরভ সূর্য্যকিরণের ন্যায় ছড়াইয়া পড়ুক, তোমার গর্ভস্থ জলকল্লোল মেঘগর্জ্জনবৎ

ধ্বনিত হইতে থাকুক, তোমার মুখ ছিদ্রের সহিত আমাদের অধরোষ্ঠের যেন তিলেক বিচ্ছেদ না হয়। স্বস্তি। স্বস্তি! স্বস্তি!"

ইতি হুকার জন্ম কথা সমাপ্ত।*

ফল-কথা

এই হুকার জন্মকথা যিনি নিত্য আগ্রহ ও অবহিতচিত্তে শ্রবণ করেন তাঁহার অন্তে ধূম লোকবাস হয়। যিনি একবার মাত্র শ্রবণ করেন তাঁহার পুণ্যের ইয়ত্তা থাকে না।

যিনি ধূমপান করেন দেবী ধূমাবতী ও

* হুকার সৃষ্টি হওয়ায় মর্ত্যলোকে ধূমপান অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, এইরূপ খবর পাওয়া গিয়াছে। সেই জন্য তামাক সাজিবার নিমিত্ত, একদল হুঁকার প্রয়োজন হওয়ায় ধূম্রলোকবাসীগণ মর্ত্যলোকে সিগারেট ও বিড়ি পাঠাইয়াছেন,—বালকেরা সিগারেট ও বিড়ি খাইয়া অকালে মর্ত্যদেহ ত্যাগ করিয়া ধূম্রলোকে গিয়া তামাক সাজিবে, এই উদ্দেশ্য।

অসুরশ্রেষ্ঠ ধূম্রলোচন সকল বিপদে তাঁহার সহায় হন; তাঁহার বুদ্ধির জড়তা থাকে না, মাথা বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠে, কল্পনা অতীব প্রতিভাশালী হয়, তিনি সম্ভব অসম্ভব নানা গল্প গুজবের সৃষ্টি করিতে পারেন, দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার প্রতি সদা প্রসন্ন থাকেন। যিনি হুকার নিন্দা করেন জন্মান্তরে শৃগালদেহধারণ করিয়া তাঁহাকে কেবল 'হুকা হুয়া' করিতে হয়।

সূচী